وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

‘আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না সেই সকল দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন যার অধিবাসীরা অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন পক্ষ অবলম্বনকারী নিযুক্ত করুন এবং আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন’ (সূরা নিসা, ৪/৭৫)

●৯ম বর্ষ ●১০ সংখ্যা ●আগস্ট ২০২৫

Web : www.al-itisam.com

সম্পাদকীয়

উপনিবেশের শিকলে আফ্রিকা: ত্রাওরের বিপ্লব ও মুসলিমদের বাস্তবতা

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٩ ، صفر و ربيع الأول ١٤٤٧هـ/ أغسطس ٢٠٢٥م العدد:١٠، الجزء : ١٠٦
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৭ ‖ ঈসায়ী ২০২৫ ‖ বঙ্গীয় ১৪৩২

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- আগস্ট	০৬- ছফর	শুক্রবার	০৪.০৫	০৫.২৮	১২.০৫	৩.২৯	৬.৪২	৮.০৪
০৫- আগস্ট	১০- ছফর	মঙ্গলবার	০৪.০৮	০৫.২৯	১২.০৪	৩.২৯	৬.৩৯	৮.০১
১০- আগস্ট	১৫- ছফর	রবিবার	০৪.১১	০৫.৩১	১২.০৪	৩.২৯	৬.৩৬	৭.৫৬
১৫- আগস্ট	২০- ছফর	শুক্রবার	০৪.১৪	০৫.৩৪	১২.০৩	৩.২৯	৬.৩২	৭.৫২
২০- আগস্ট	২৫- ছফর	বুধবার	০৪.১৭	০৫.৩৫	১২.০২	৩.২৯	৬.২৮	৭.৪৬
২৫- আগস্ট	০১- রবী: আউ:	সোমবার	০৪.২০	০৫.৩৭	১২.০০	৩.২৮	৬.২৩	৭.৪১
৩০- আগস্ট	০৬- রবী: আউ:	শনিবার	০৪.২২	০৫.৩৯	১১.৫৯	৩.২৭	৬.১৯	৭.৩৬

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	-১	০
নারায়ণগঞ্জ	+১	০	-১
নরসিংদী	-১	-২	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-৩	-১
টাঙ্গাইল	+১	+১	+৩
ফরিদপুর	+৩	+২	+২
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	+১	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৫	+৩	+১
মাদারীপুর	+৩	+২	০
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+১
শরিয়তপুর	+২	+১	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-২	+২
শেরপুর	-১	-১	+৪
জামালপুর	-১	-১	+৪
নেত্রকোনা	-৪	-৩	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-২	-৪	-৮
খাগড়াছড়ি	-৪	-৬	-৭
রাঙ্গামাটি	-৪	-৬	-৮
বান্দরবান	-৩	-৬	-১০
কুমিল্লা	-২	-৫	-৩
নোয়াখালী	০	-২	-৪
লক্ষ্মীপুর	০	-১	-১
চাঁদপুর	+১	০	-২
ফেনী	-২	-৩	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৪	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৮	-৪
সুনামগঞ্জ	-৭	-৭	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৬	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৫	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৬	+১০
নাটোর	+৫	+৪	+৭
পাবনা	+৫	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+২	+১	+৪
বগুড়া	+২	+২	+৬
নওগাঁ	+৪	+৪	+৮
জয়পুরহাট	+৩	+২	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	০	+৮
দিনাজপুর	+৩	+৩	+১০
গাইবান্ধা	০	০	+৬
কুড়িগ্রাম	-২	-১	+৭
লালমনিরহাট	-১	-১	+৮
নীলফামারী	+১	+২	+১০
পঞ্চগড়	+১	+২	+১২
ঠাকুরগাঁও	+২	+৩	+১২

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৬	+৫	+২
বাগেরহাট	+৬	+৪	+১
সাতক্ষীরা	+৮	+৮	+৪
যশোর	+৭	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৪	+৫
মেহেরপুর	+৮	+৬	+৭
মাগুরা	+৫	+৪	+৩
নড়াইল	+৬	+৪	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৩	+২	-২
পটুয়াখালী	+৪	+২	-২
পিরোজপুর	+৫	+৪	-১
ঝালকাঠি	+৪	+২	-১
ভোলা	+২	+১	-৩
বরগুনা	+৬	+৪	-২

■ সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

৯ম বর্ষ
১০ম সংখ্যা

আগস্ট ২০২৫
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩২
ছফর-রবীউল আউয়াল ১৪৪৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা

- শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
- শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
- শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
মো: নাসির উদ্দিন ◈ আল আমিন
◈ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার: মো: নাইমুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে কুরআন
» মুসলিমদের অবক্ষয়ের কারণ ও উত্তরণের পথ (শেষ পর্ব) ০৪
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান (পর্ব-৫) ০৬
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী-৬ষ্ঠ পর্ব) ১০
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» ইসলামের দৃষ্টিতে বায়তুল মাক্বদিস: মর্যাদা, গুরুত্ব ও ফযীলত ১২
-মাহবূবুর রহমান মাদানী
» টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করার ভয়াবহতা ১৪
-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস
» গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি ১৮
-সাঈদুর রহমান
» রহস্যময় মানব মস্তিষ্ক ২০
-মো. হারুনুর রশীদ
» আদ-দাওয়া ইলাল্লহ: এসো! আল্লাহর পথে... (পর্ব-২) ২৩
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

◈ উসওয়াতুন হাসানাহ
» কঠিন বিপদে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতেন ২৬
-হাসান আল-বান্না মাদানী

◈ তরুণ প্রতিভা
» জীবনের মূল্যবান বিষয়ের প্রতি যত্নশীল হোন ২৯
মূল: শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর
-অনুবাদ: আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল হাফীয

◈ দিশারী
» আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমাদের জীবন ৩১
-আব্দুল হাসিব বিন আব্দুর রহমান

◈ জামি'আহ পাতা
» ধৈর্যশীল হোন! ৩৪
-মমিনুল ইসলাম বিন আলী আকবর

◈ মনীষীদের জীবনী
» শায়খ রাবী বিন হাদী আল মাদখালী রাহিমাহুল্লাহ (১৯৩৩-২০২৫) ৩৬
-সংগৃহীত ও পরিমার্জিত: ড. যায়নুল আবেদীন বিন নুমান মাদানী

◈ হাদীছের গল্প
» পাঠশালায় একদিন... ৩৭
-মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার

◈ কবিতা ৪০

◈ সংবাদ ৪১

◈ জামি'আহ ও দাওয়াহ সংবাদ ৪৪

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৬

সার্বিক যোগাযোগ

প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

উপনিবেশের শিকলে আফ্রিকা: ত্রাওরের বিপ্লব ও মুসলিমদের বাস্তবতা

মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ সমস্যার মূল শিকড় ইউরোপীয় উপনিবেশ। ফিলিস্তীন-ইসরাঈল সংঘাত থেকে শুরু করে কাশ্মীর-ভারত বিরোধ, ভারতীয় মুসলিমদের বঞ্চনা, রোহিঙ্গা-মায়ানমার সংকট এবং আফ্রিকান মুসলিমদের উপর চলমান নির্যাতন—এসব সবকিছুর উৎসই উপনিবেশ। আজও মুসলিমদের জীবনধারায় সেই ঔপনিবেশিক ছায়া স্পষ্ট।

যেমন ফেরাউনের যুগের দীর্ঘ দাসত্ব ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম -এর সন্তান বনি ইসরাঈলের স্বভাব-চরিত্রকে বদলে দিয়ে তাদেরকে এক আত্মবিশ্বাসী জাতি থেকে পরিণত করেছিল আত্মগ্লানিতে ভোগা, দাসত্বপুষ্ট এক জনগোষ্ঠীতে—ঠিক তেমনিভাবে ইউরোপীয় উপনিবেশও মুসলিমদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যকে ভেঙে দিয়েছে। মিথ্যা, দুর্নীতি, বিশ্বাসভঙ্গ ও দায়িত্বের খেয়ানত আজ আমাদের সমাজে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে মুসলিম সমাজে সহজেই বিভক্তি সৃষ্টি করা যায়, কারণ অনেকেই ক্ষমতার লোভে বা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যায়। এটাই গোলামের মানসিকতা—যার একটি স্পষ্ট উদাহরণ আফ্রিকায় ফরাসি উপনিবেশ।

আফ্রিকা একটি খনিজ-সমৃদ্ধ মহাদেশ। বিশ্বের মোট স্বর্ণের প্রায় ২০–২৫% আফ্রিকা সরবরাহ করে। হীরার ক্ষেত্রে এই হার ৬০–৭০%, প্লাটিনামের ৮০% আসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। কঙ্গোতে উৎপাদিত হয় কোল্টানের ৬০–৭০%, যা আধুনিক ইলেকট্রনিক্স, বিশেষ করে স্মার্টফোন তৈরিতে অপরিহার্য। এছাড়াও বিশ্বের বক্সাইটের ২০–২৫% আসে আফ্রিকা থেকে, যা অ্যালুমিনিয়ামের মূল কাঁচামাল। এত সমৃদ্ধ একটি মহাদেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা শোষিত হয়েছে—প্রকাশ্যেও, আবার ছদ্মবেশেও। ইউরোপ আফ্রিকার সম্পদে আলোকিত, অথচ আফ্রিকা আজও অন্ধকারে। এটি আধুনিক যুগের অন্যতম নির্মম বাস্তবতা।

আফ্রিকায় উপনিবেশ শুরু হয় ১৬২৪ সালে সেনেগালের উপকূলীয় অঞ্চলে ফরাসিদের বাণিজ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে—যেমনটা উপমহাদেশেও হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে। ভারতীয় মুসলিমদের মতো আফ্রিকার মুসলিমরাও ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইতালির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন জিহাদ করেছেন। যেমন আমাদের ছিল তিতুমীর বা শাহ ইসমাইলের মতো বীর, তেমনি তাদেরও ছিল উপনিবেশবিরোধী জিহাদে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ববর্গের ইতিহাস যেমন, মরু-সিংহ উমার আল-মুখতার, হাজী উমার আল-ফুতি, সামোরি তুরে রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তির পরাজয়ের পর তারা বাধ্য হয় উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দিতে। আমরা যেমন ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন করি, আফ্রিকার অনেক দেশও ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে স্বাধীনতা পায়। তবে সেই স্বাধীনতা ছিল শর্তযুক্ত সীমিত স্বাধীনতা। বিশেষ করে ফ্রান্স যেসব শর্ত আরোপ করেছিল, তা ছিল একরকম আধুনিক ঔপনিবেশিকতা।

ফ্রান্স 'Françafrique' নামে একটি প্রভাবশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করে এবং প্রায় ১৪টি আফ্রিকান দেশকে এর আওতায় নিয়ে আসে। এই দেশগুলোর জন্য ফ্রান্সের প্রদত্ত শর্তগুলোর মধ্যে ছিল:

(১) ফ্রান্সের তৈরি CFA ফ্রাঙ্ক মুদ্রা ব্যবহার করতে হবে, যার মান নির্ধারণ করবে ফ্রান্স ইউরোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে।

(২) ঔপনিবেশিক সময়ের তথাকথিত উন্নয়নের জন্য দেশগুলোকে কর দিতে হবে।

(৩) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৮০% রিজার্ভ ফ্রান্সে রাখতে হবে, যার মধ্যে বছরে মাত্র ১৫% ব্যবহারের অনুমতি থাকবে। অতিরিক্ত দরকার হলে সেই টাকায় ঋণ নিতে হবে, যার সীমা সর্বোচ্চ ২০%।

(৪) দেশের খনিজ সম্পদ উত্তোলনে ফ্রান্স পাবে অগ্রাধিকার।

(৫) সরকারি টেন্ডারগুলোতে ফরাসি কোম্পানিগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৬) প্রতিরক্ষা ও সামরিক সহযোগিতা কেবল ফ্রান্সের মাধ্যমেই নিতে হবে—অস্ত্র কেনা বা প্রশিক্ষণ অন্য কোনো দেশ থেকে নেওয়া যাবে না।

(৭) ফরাসি ভাষাকে করতে হবে রাষ্ট্রভাষা।

(৮) শিক্ষা কারিকুলাম নির্ধারণ করবে ফ্রান্স।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ভারতের সাথে কাছাকাছি এরকম সাত দফা চুক্তি হয়েছিল।

টোগো, মালি ও গিনি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর না করায় ফ্রান্স তাদের কঠোর শাস্তি দেয়। গিনিকে পরিণত করে ধ্বংসস্তূপে, আর টোগো ও মালির প্রেসিডেন্টদের হত্যা করা হয়। যেহেতু ফরাসি সেনা প্রশিক্ষণে তৈরি এই দেশগুলোর সেনাবাহিনী মূলত ফ্রান্সের অনুগত, তাই অভ্যুত্থান ঘটানো তাদের পক্ষে সহজ। টাকার কাছে বিক্রি হয়ে সেনাবাহিনী নিজেদের দেশের বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়। গত ৫০ বছরে আফ্রিকার ২৬টি দেশে ৭০টিরও বেশি সেনা অভ্যুত্থান ঘটেছে।

তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আফ্রিকাকে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। যেমন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সিরিয়া ও আফগানিস্তানের মুজাহিদদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে, তেমনি এই যুদ্ধের উপকার এখন আফ্রিকার মুসলিম বিদ্রোহীরাও পাচ্ছে। কারণ ফ্রান্স এখন ইউক্রেনকে সহযোগিতা করতে গিয়ে নিজের প্রতিরক্ষা ব্যয়েই হিমশিম খাচ্ছে। এই সুযোগে মালি, নাইজার ও বুরকিনা ফাসোতে দেশপ্রেমিক সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নেতৃত্বের নাম ইবরাহীম ত্রাওরে। তিনি পশ্চিমা মিডিয়া, IMF, WHO—এসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন। তাদেরকে তিনি অভিহিত করেন মিথ্যাবাদী, স্বার্থান্বেষী এবং বিশ্বব্যবস্থার দাসত্ব প্রতিষ্ঠাকারী শক্তি হিসেবে।

ত্রাওরে বুরকিনা ফাসোর জন্য নিজস্ব মুদ্রা চালু করেছেন, দেশের সোনা খনি জাতীয়করণ করেছেন এবং সাহেল নামে একটি নতুন জোট গঠন করেছেন 'Alliance of Sahel States (AES)'। সাহারা মরুভূমি ও সবুজ ভূমির সংযোগস্থলকে সাহেল বলা হয়। এই জোট প্রকাশ্যে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তাদের অন্যতম মূলনীতি— দেশের খনিজ দেশের মানুষের জন্য ব্যয় হবে।

তবে চ্যালেঞ্জ হলো, কোনো বিপ্লব যদি আদর্শ ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা টিকে থাকে না। ইসলামের চেয়ে আদর্শগতভাবে পরিপূর্ণ ও মানবকল্যাণমুখী কোনো সিস্টেম পৃথিবীতে নেই। ইবরাহীম ত্রাওরে সরাসরি ইসলামবিরোধী না হলেও, ইসলামকে রাষ্ট্রক্ষমতায় দেখতে চান না। উপনিবেশ মুসলিমদের মধ্যে এমন এক হীনম্মন্যতা ঢুকিয়ে দিয়েছে, যার কারণে আজ অনেক মুসলিম বিপ্লবীও মনে করেন—ইসলামের নাম নিলে তিনি সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হবেন। তাই তারা ইসলামকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ রাখেন এবং রাষ্ট্রপর্যায়ে দাসত্ব বজায় রাখেন। শুধু মনিব পরিবর্তন হয়, কাল ইউরোপের দাস আজ আমেরিকার দাস এবং আগামীকাল চীন-রাশিয়ার দাস। ফলে অনেক সময় দেখা যায়, পশ্চিমাবিরোধী বিপ্লবী শক্তি নিজেরাও কোনো না কোনো ইসলামবিরোধী এজেন্ডার অংশ হয়ে পড়ে। যেমন ইবরাহীম ত্রাওরে ওয়াগনার বাহিনীর মাধ্যমে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে মুসলিমদের ওপরই হামলা চালাচ্ছেন।

ইবরাহীম ত্রাওরের উত্থান উপনিবেশবিরোধী চেতনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঠিক আছে, কিন্তু এটি সমাধান নয়। মুসলিমদের একমাত্র মুক্তির পথ হলো ইসলাম। ইসলামের আদর্শের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে, হীনম্মন্যতা ঝেড়ে ফেলে গর্বের সাথে ইসলামকে ধারণ করে ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। একমাত্র ইসলামই দিতে পারে সত্যিকার স্থায়ী মুক্তি। *(প্র. স.)*

মুসলিমদের অবক্ষয়ের কারণ ও উত্তরণের পথ

-মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল*

(শেষ পর্ব)

তৃতীয় বিষয়, আসমানী কিতাবে নৈতিক আদর্শের শিক্ষা:

প্রথম শর্ত হলো বিভিন্ন ধর্মে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা: নৈতিকতা মানবজীবনে মৌলিক কল্যাণ বয়ে আনে, তাই যখন মানুষের নৈতিক কাঠামো সঠিক হয় এবং তা বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সুখী জীবন লাভ করে। কিন্তু নৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হলে বা বাস্তবায়নের গ্যারান্টি না থাকলে মানুষ দুর্দশার কবলে পতিত হয়। ইসলামী বিধান অনুযায়ী সেই ব্যক্তির কথা যুক্তিনির্ভর, যিনি নির্ভুল নৈতিক কাঠামোর আলোকে মহাবিশ্বকে দেখেন। কারণ ভালো কিংবা মন্দ, আমল যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তা নিরর্থক হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব। যখন বলা হয়, মহাবিশ্বের সিস্টেম একটি নৈতিক সিস্টেম, তখন এর অর্থ হলো প্রথমত মানুষ যে কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে তা ভালো হোক বিংবা মন্দ হোক তার প্রভাবের আলোকে মহাবিশ্বের কার্যক্রম আবর্তিত হয় এবং দ্বিতীয়ত এই ভালো ও মন্দ কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানুষের কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন, যাতে কাজের ভালো-মন্দের আলোকে তাকে প্রতিদান দেওয়া যায়। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত বিষয়দ্বয়ে বিশ্বাস করে, তবে সে বিদ্যমান জগতের উপর একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম নৈতিক শৃঙ্খলার আধিপত্যের উপর বিশ্বাস করল।

এখানে লক্ষণীয় যে, জমহূর উলামা এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ নৈতিকতার প্রভাব বা জীবনে এর গঠনমূলক ভূমিকাকে অস্বীকার করেন না। বিংশ শতাব্দীর আলেমদেরকে অধিবিদ্যা এবং আত্মিক জগতে বিশ্বাস করতে যে কারণটি আবশ্যিকভাবে আহ্বান করেছে, তা হলো সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা, যা দর্শন ও শিল্পনীতির প্রচার এবং নৈতিক আইন বাস্তবায়নের অপরিহার্যতা বিদ্যমান না থাকার ফল। নৈতিকতা সমগ্র বিশ্বে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রসারিত করে, হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, প্রতিভাকে উন্মুক্ত করে, আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং সবাইকে এক পরিবারের ভাই ও সদস্য করে তোলে। যেমনভাবে এটা মানুষকে কল্যাণ ও ভালো কাজে উৎসাহিত করে তোলে এবং তাকে আধ্যাত্মিক মর্যাদার আসনে আসীন করে, যাতে সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত বা এর চেয়ে উচ্চতর অবস্থানের অধিকারী হয়।

দ্বিতীয় শর্ত হলো ইসলাম ও নৈতিকতার স্থায়িত্ব: যেকোনো নিরপেক্ষ গবেষকের নিকট এটা পরিষ্কার যে, মানুষের পরিপূর্ণতা, তার জ্ঞান অর্জন এবং মর্যাদা সমুন্নত করা ইসলামী বিধানের অংশ। যদি ইসলামী নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত না হতো, তাহলে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না। মানবজীবন চলার পথে মহৎ ব্যক্তিগণ তাদের কাজের মাধ্যমে নৈতিকতার মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিপরীতে তারা মহৎ কাজ সম্পাদন, সংরক্ষণ এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা চালিয়েছেন। ইসলামী সভ্যতা বিভিন্ন জাতির সাথে লেনদেন করেছে, বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে মিশেছে এবং বহুবিধ রীতিনীতি ও ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করেছে। ইসলামী সভ্যতা মুসলিম জাতির বিশ্বাস এবং ইসলামের আন্তর্জাতিক দর্শনকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। নগরায়ণ, সভ্যতা, ঐতিহ্য এবং মানুষের সামাজিক রীতিনীতিতে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আমরা যদি নৈতিক আদর্শ বিবর্জিত পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে নযর দিই, তবে মানবসভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং চরম ধ্বংসাত্মক পরিণতি লক্ষ্য করি। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, একটি পথহারা সমাজের সামনে সমাধানের একমাত্র কল্যাণকর উপায় হলো নৈতিকতা অবলম্বন, যা তার জন্য একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হতে পারে।

ইসলাম তার অনুসারীদের এমনভাবে গড়ে তোলে যে, তারা জীবনের সকল পরিস্থিতিতে নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, যাতে নৈতিক শিক্ষাগুলো দরিদ্রতা, দুর্বলতা, অক্ষমতা বা

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

পেশিশক্তির প্রভাবে উপেক্ষিত না হয়। এছাড়াও ছদ্মবেশ ধারণ করা বা লোক দেখানো অথবা হারাম সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ইত্যাদি নৈতিক পদস্খলন। ইসলাম তাক্বওয়া ও দৃঢ়তার বহিঃপ্রকাশ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ - لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

‘শুনে রাখো! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই আর তারা পেরেশানও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবী জীবনে এবং আখেরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসফলতা’ *(ইউনুস, ১০/৬২-৬৪)*। ইসলাম মানুষকে বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমানভাবে দেখে। নৈতিক শিক্ষা, ইসলামী নিদর্শন ও সামাজিক আদর্শ বাস্তবায়নে ইসলাম কাউকেও বিশেষ সুবিধার অধিকারী মনে করে না।

যেমন আমরা যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাক্কী জীবনের বছরগুলো পর্যবেক্ষণ করি, তখন ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা কম এবং মুশরিক আরবদের অত্যাচারের ভয়ে মক্কার উপকণ্ঠে আত্মগোপন থাকা সত্ত্বেও কুরআনের বিধানে কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায়নি। মুমিনগণ যেখানেই থাকুক না কেন কুরআনের আয়াতের প্রতিধ্বনি সকল মানুষের জন্য সমান। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ ‘এটি বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়’ *(আত-তাকভীর, ৮১/২৭)*।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, ইসলামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সকল সাধারণ প্রশিক্ষণ দেওয়া। কোনো নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের সাথে এ প্রশিক্ষণ সীমাবদ্ধ নয়।

তৃতীয় শর্ত ধর্মের নৈতিক ব্যবস্থা:

মহাজগতের পরিচালক আল্লাহর ইচ্ছা হলো ইসলামী নৈতিক ব্যবস্থাপনার আলোকে বিশ্বমণ্ডল পরিচালনা করা। সমস্ত বস্তুগত ও নৈতিক শক্তির মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িত হয়। কারণ এই ব্যবস্থাপনায় একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় আর তা হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানুষের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ মানসিকতাকে সন্তুষ্ট করা, যেখানে তাদের আনুপাতিকতা এবং সামঞ্জস্য সংরক্ষিত থাকে। যদিও দার্শনিক মতবাদের সিস্টেমগুলো এই অনুপাতটি সুরক্ষিত করতে অক্ষম। কারণ তারা মানবাত্মা বা এর সীমানার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুসন্ধান করেনি। ইসলামী নৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে সুখী করে, যেহেতু মানুষের সমস্ত সহজাত চাহিদা এতে বিবেচনায় আনা হয়।

ইসলাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ‘আর মন্দের প্রতিদান মন্দের অনুরূপ হবে। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপসে মীমাংসা করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ যালেমদের পছন্দ করেন না’ *(আশ-শূরা, ৪২/৪০)*। যদি কোনো মুমিন অন্যায়ের শিকার হয়, তবে সে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না এবং তাকে অবশ্যই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে হবে। রাগান্বিত অবস্থায় ক্ষমা করে দেওয়ার মহান আদর্শের সাথে এটি সাংঘর্ষিক নয়। এমন ইতিবাচক ও গঠনমূলক কর্মসূচি মুমিনদের প্রতি অবিচারের পরিণতি সম্পর্কে অত্যাচারীদেরকে সতর্ক করে। কারণ তারা এক্ষেত্রে নীরব থাকে না, বরং তাদের মুখের সামনে দাঁড়ায়। আর পতিতার অপকর্ম ও পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অন্যায় নয়।

পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে আল-কুরআনের শিক্ষা ব্যতীত কোনো শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে না। আল-কুরআন শিক্ষায় আমাদের সন্তান ও আধুনিক প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। মানুষের চারিত্রিক বিকাশ, আধ্যাত্মিক উন্নতি, হাতে-কলমে তার আদর্শের অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে তার মানবতা ও উদারতার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। ইহকাল ও পরকালে শান্তিপূর্ণ জীবন লাভের একমাত্র উপায় আদর্শবান মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। এজন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করা প্রতিটি মুমিন মুসলিমের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের আল-কুরআনের শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার এবং আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে আদর্শ প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান

*-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-৫)

মুরদানের প্রতি আসক্তির কারণ:

আসলে কারণ ছাড়া কোনো কিছুই ঘটে না। সব ঘটনার পেছনে কোনো না কোনো কারণ বিদ্যমান। মুরদানের প্রতি আসক্তির পেছনেও রয়েছে অনেক কারণ। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ উপস্থাপিত হলো—

(১) ঈমানের দুর্বলতা ও অন্তর থেকে আল্লাহর ভালোবাসা দূরে সরে যাওয়া এবং তাঁর শাস্তির ভয় কমে যাওয়া: এটি যাবতীয় পাপের মূল কারণ। দুর্বল ঈমান, আল্লাহ তাআলা থেকে হৃদয়ের দূরত্ব, তাঁর প্রতি অনুরাগ ও সান্নিধ্যের অভাব একজন মানুষকে যেকোনো পাপে নিপতিত করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 'কোনো যেনাকার যখন যেনা করে, তখন সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন থাকে না। কোনো চোর যখন চুরি করে, তখন সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন থাকে না এবং কোনা মদপানকারী যখন মদ পান করে, তখন সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন থাকে না'।[১]

(২) দাড়িবিহীন যুবকদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং তাদের সৌন্দর্য ও আকর্ষণে আসক্ত হওয়া: মূলত এটিই পাপের প্রথম ধাপ। সেজন্যই তো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হারামের দিক থেকে দৃষ্টি অবনত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।[২] ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَالنَّظَرُ أَصْلُ عَامَّةِ الْحَوَادِثِ الَّتِي تُصِيبُ الْإِنْسَانَ، فَالنَّظْرَةُ تُوَلِّدُ خَطْرَةً، ثُمَّ تُوَلِّدُ الْخَطْرَةُ فِكْرَةً، ثُمَّ تُوَلِّدُ الْفِكْرَةُ شَهْوَةً، ثُمَّ تُوَلِّدُ الشَّهْوَةُ إِرَادَةً، ثُمَّ تَقْوَى فَتَصِيرُ عَزِيمَةً جَازِمَةً، فَيَقَعُ الْفِعْلُ وَلَا بُدَّ، مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ، وَفِي هَذَا قِيلَ: الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ أَيْسَرُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى أَلَمِ مَا بَعْدَهُ.

'মানুষকে যে বিপদগুলো ঘিরে ধরে, তার বেশিরভাগের ক্ষেত্রে মূল কারণই হচ্ছে **দৃষ্টি**। দৃষ্টি চিন্তার জন্ম দেয়, চিন্তা কল্পনার জন্ম দেয়, কল্পনা কামনার জন্ম দেয়, কামনা থেকে আসে ইচ্ছা, ইচ্ছা প্রবল হয়ে তা বাস্তবায়িত হয়—যদি না কোনো বাধা তাকে থামিয়ে দেয়। এজন্যই বলা হয়: **'চোখ নামিয়ে রাখার ধৈর্য পরবর্তীতে যে কষ্ট আসতে পারে তা সহ্য করার চেয়েও সহজ'**।[৩]

(৩) ফরয ও নফল ইবাদতে গাফিলতি: ইবাদতে গাফিলতি বা উদাসীনতা একজন মানুষকে যেকোনো পাপে নিমজ্জিত করতে পারে। সেজন্য যদি মুরদানের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি ছালাতগুলো যথা সময়ে ও যথা নিয়মে আদায় করত, তাহলে সেগুলোই তাকে অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখত। মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ 'নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*। তাহলে ভাবুন, যদি কেউ নিয়মিত সুন্নাত ও নফল ছালাতের প্রতি যত্নবান হয়, তাহলে তার ফল কত মিষ্টি হতে পারে!

(৪) কুরআন মাজীদ ত্যাগ করা এবং সৎলোকদের জীবনচরিত ও বড় আলেমদের জীবনী পড়া পরিত্যাগ করা: আল্লাহর কিতাবে রয়েছে হেদায়াত, আলো এবং আরোগ্য। তাই এটা পাপ থেকে বাঁচার শ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা; আর যারা পাপে লিপ্ত, তাদের জন্য শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। ফলে যখন কেউ বড় আলেমদের জীবনচরিত পড়ে, তখন তাদেরকে আদর্শ মনে করে, তাদের সান্নিধ্যে মানসিক শান্তি লাভ করে এবং নীচতা থেকে নিজেকে তুলে আনতে সচেষ্ট হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ 'তার চেয়ে বেশি যালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, অথচ সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং যা (পাপ) তার দুই হাত আগেই করে রেখেছে, সে তা ভুলে গেছে! নিশ্চয়ই আমি তাদের হৃদয়সমূহের উপর পর্দা দিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে। আর

---

* বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৭৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭।

২. দ্রষ্টব্য: সূরা আন-নূর, ২৪/৩০-৩১।

৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাওয়াইশ শাফী, পৃ. ১৫৩।

তাদের কানসমূহে রয়েছে বধিরতা এবং আপনি যদি তাদেরকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান করেন, তবুও তারা কখনই হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে না' *(আল-কাহফ, ১৮/৫৭)*।

(৫) জ্ঞানার্জনে গাফেলতি: জ্ঞান হলো আলো। এর মাধ্যমে কেউ হালাল সম্পর্কে জেনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে এবং হারাম সম্পর্কে জেনে তা বর্জন করতে পারে। সে মহান আল্লাহর নাম, গুণ ও কর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁকে চিনতে পারে। এতে কোনো নিকৃষ্ট কাজ করার ক্ষেত্রে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও লজ্জা সৃষ্টি হয়। এমনকি তার হৃদয়ে ফেরেশতামণ্ডলী থেকেও লজ্জা সৃষ্টি হয়। জ্ঞানের মাধ্যমে সে পাপিষ্ঠদের অবস্থা এবং আল্লাহ তাদের জন্য কী শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা জানতে পারে। ক্বাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَوْا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عُصِيَ بِهِ فَهُوَ جَهَالَةٌ، عَمْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীগণ একত্রিত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যা কিছুর মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়, তা অজ্ঞতা (জাহালাত),— তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত'।[৪]

ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ: مَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفَ كَانَ لَهُ أَخْوَفَ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: ٢٨] 'আহমাদ ইবনু আছেম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বেশি চেনে, সে-ই তাঁর থেকে বেশি ভয় করে। একথার প্রমাণ হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী— ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ "আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই (সত্যিকারভাবে) ভয় করে" *(ফাতির, ৩৫/২৮)*।[৫]

(৬) জীবনে অতিরিক্ত ফাঁকা সময় থাকা: যদি কেউ তার সময় ইবাদতে, জ্ঞানার্জনে বা যেকোনো বৈধ কাজে ব্যয় করে, তাহলে সে হারাম কাজ করা তো দূরের কথা, এমনকি হারাম কাজ করার কথা চিন্তা করারই সময় পাবে না। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত ফাঁকা সময় ভালো কাজে না লাগালে তা পাপ কামাইয়ের বাহন হতে পারে। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ. فَمَا انْتَفَعْتُ مِنْهُمْ إِلَّا بِكَلِمَتَيْنِ، سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: الْوَقْتُ سَيْفٌ. فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَإِلَّا قَطَعَكَ. وَنَفْسُكَ إِنْ لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ، وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ. 'আমি ছূফীদের সঙ্গ পেয়েছি, কিন্তু তাদের থেকে দুটি বাক্য ছাড়া উপকার পাইনি। তাদের বলতে শুনেছি— ১. সময় হলো একটি তলোয়ার; তুমি যদি তাকে কাটতে পারো, তাহলে তো ভালো। অন্যথা সে-ই তোমাকে কেটে ফেলবে। ২. তোমার মনকে যদি তুমি সঠিক কাজে ব্যস্ত না রাখো, তবে তা বৃথা কাজে তোমাকে ব্যস্ত করে ফেলবে'।[৬] শায়খ আব্দুর রহমান আস-সুদাইস হাফিযাহুল্লাহ বলেন, وَكَمْ كَانَ الْفَرَاغُ سَبَبًا فِي الِانْحِرَافِ بِكُلِّ ضُرُوبِهِ، وَالْفَسَادِ بِشَتَّى صُوَرِهِ، عِندَ عَدَمِ اسْتِثْمَارِهِ، فَهُوَ مِنَّةٌ وَنِعْمَاءُ، لَكِنْ إِذَا اسْتُغِلَّ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَهُوَ نِقْمَةٌ وَبَلَاءٌ 'ফাঁকা সময় নানা ধরনের বিপথগামিতা ও বিচিত্র রকমের ফ্যাসাদের কত-না কারণ হয়েছে, যখন এই সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি। এটি একদিকে আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ ও নিয়ামত। কিন্তু যদি তা আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যবহৃত হয়, তবে সেটি হয়ে দাঁড়ায় এক অভিশাপ ও বিপদ'।[৭] সেজন্যই তো আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَنْ أَرَاهُ، فَارِغًا، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا، وَلَا عَمَلِ الْآخِرَةِ 'আমি কাউকে এমন অলস বসে থাকতে দেখে খুব ঘৃণা করি যে, সে না দুনিয়ার কোনো কাজ করছে, না আখিরাতের কোনো কাজ করছে'।[৮] সত্যি কথা বলতে মুমিনজীবনে ফাঁকা সময় বলে আসলে কিছু নেই।

(৭) খারাপ বন্ধু ও অসৎ সঙ্গী গ্রহণ করা: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারাপ সঙ্গীকে কামারের সাথে তুলনা করেছেন; যে হয় তার সঙ্গীর পোশাক পুড়িয়ে দেয়, না হলে সে তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পায়।[৯] বন্ধুর ভালো বা মন্দ যেকোনো স্বভাব বন্ধুর মাঝে খুব সহসাই প্রবেশ করে। তাই তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/২৩৫।

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন বায়না ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় সংস্করণ: ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খৃ.), ৩/৩৭৬।

৬. মাদারিজুস সালিকীন, ৩/১২৪-১২৫।

৭. দুরূসুশ শায়খ আব্দির রহমান আস-সুদাইস, দারস নং ৫৯। এগুলো মূলত: শায়খের লেকচার, যা http://www.islamweb.net কর্তৃপক্ষ টেক্সট-এ রূপান্তরিত করেছে। دروس للشيخ عبد الرحمن السديس নামে মাকতাবাহ শামেলায় তথ্যটি পাওয়া যাবে।

৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, আছার নং ৩৪৫৬২; আবূ দাঊদ, আয-যুহদ, আছার নং ১৭৪; আবূ নু'আইম ইছফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৩০।

৯. হাদীছটি দেখুন: ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬২৮।

বলেছেন, اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ‘একজন মানুষের জীবনধারা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই হয়ে যায়। তাই তোমাদের প্রত্যেকের উচিত গভীরভাবে চিন্তা করা— কার সঙ্গে সে বন্ধুত্ব গড়ছে’।[১০] সেজন্যই খারাপ কাউকে বন্ধু বানানো যাবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন, لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ‘তুমি মুমিন ব্যতীত কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না আর পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খাবার না খায়’।[১১] অসৎ সঙ্গী বিষের মতো প্রাণঘাতী। অতএব, সাবধান!

(৮) বিয়ে না করা: মহান আল্লাহ পুরুষদের মধ্যে স্বাভাবিক কামনা সৃষ্টি করেছেন এবং তা পূরণের বিষয়টি নারীদের মধ্যেই নিহিত করেছেন। আর এর একমাত্র হালাল পথ হলো বিবাহ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‘হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে। আর যার সেই সামর্থ্য নেই, সে যেন ছওম রাখে। কারণ ছওম তার কামনাকে নিয়ন্ত্রণের উপায়’।[১২]

অতএব, যার স্বভাব রূপান্তরিত হয়ে যায়, সে এই কামনা পুরুষদের মাঝেই মেটাতে চায়। এতে সে পশুর থেকেও নিচে নেমে যায়। পশুদের মধ্যেও কি আমরা কোনো মর্দা পশুকে আরেক মর্দা পশুর ওপর চড়তে দেখি? সুতরাং বিয়ের মাধ্যমে যৌন পবিত্রতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

(৯) অশ্লীলতা উপস্থাপনকারী টেলিভিশন চ্যানেল দেখা: যেখানে নারীদের ছবি দেখানো হয় এবং ফেতনা ও অসভ্যতা ছড়ানো হয়। এসব টিভি চ্যানেল মানুষকে নোংরা ভালোবাসার দিকে ঠেলে দেয়।

(১০) কারো প্রতি আকর্ষণ বা আসক্তিকে স্বাভাবিক মনে করা: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে না জানার কারণে মানুষ এ ধরনের অনৈতিক আকর্ষণে জড়ায়। কারণ এটাকে সে স্বাভাবিক মনে করে। অথচ এমন আসক্তি অত্যন্ত ভয়ানক এবং স্বভাববিরোধী।

(১১) প্রেমের কাহিনী, প্রেমমূলক উপন্যাস ও কবিতা পড়া: এসব কারণে মুরদানের প্রতি আসক্তি জন্মাতে পারে। অনুরূপভাবে গোপন বাসনা, অশ্লীল ম্যাগাজিন পড়া ও দৃষ্টি অব্যাহতভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমেও এ রোগ তৈরি হতে পারে।[১৩]

মুরদানের প্রতি আসক্তির ভয়াবহ পরিণতি:

সম্মানিত পাঠক! মুরদান তথা দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকদের প্রতি আসক্তি কতটা মারাত্মক হতে পারে, তা নিশ্চয় উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআনে কারীম ও হাদীছে নববীর পাশাপাশি উলামায়ে কেরামের কঠোর বক্তব্য আমরা দেখে এসেছি। সমগোত্রীয় মানুষের প্রতি আকর্ষণ ও দৃষ্টি বা অন্য কোনো অঙ্গের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন একজন ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির পরিচায়ক। এটি মহান আল্লাহর সৃষ্ট স্বাভাবিক ফেতরাত বা স্বভাববিরোধী। এই আসক্তি একজন মানুষকে সমকামিতা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে –নাঊযুবিল্লাহ-।

এখানে আমরা মুরদানের প্রতি আসক্তির মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কিত কয়েকটি ভয়াবহ ঘটনা উল্লেখ করছি।

ঘটনা-১: ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, আবূ আব্দিল্লাহ ইবনুল জাল্লা বলেন, আমি একবার এক সুন্দর চেহারার খ্রিষ্টান বালকের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তখন আবূ আব্দিল্লাহ আল-বালখি আমার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেনো?

আমি বললাম, চাচা! আপনি কি দেখছেন না, এই চেহারা কীভাবে আগুনে জ্বলবে! (অর্থাৎ আমি এতটাই বিমোহিত ছিলাম যে, ভাবছিলাম- এমন সুন্দর একটি চেহারাকে জাহান্নামের আগুন কীভাবে পোড়াবে!)

তিনি তখন আমার পিঠে হাত দিয়ে মারলেন এবং বললেন, তুমি এ কাজের পরিণাম অবশ্যই টের পাবে।

ইবনুল জাল্লা বলেন, আমি এ কাজের পরিণাম টের পেয়েছিলাম ৪০ বছর পরে, যখন আমি কুরআন ভুলে গিয়েছিলাম।[১৪]

---

১০. মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৪১৮, ‘হাসান’।

১১. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৪৮৩২; সুনানে তিরমিযী, হা/২৩৯৫, ‘হাসান’।

১২. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০০।

১৩. দেখুন: https://m.islamqa.info/ar/answers/94836/
https://almoslim.net/node/80108

১৪. ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪২১ হি./২০০১ খৃ.), পৃ. ২৪৬।

ঘটনা-২: একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের প্রেমে ভীষণভাবে মুগ্ধ হয়। এমনকি সে তার প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হয়ে যায় যে, প্রেমের কষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু যার প্রতি সে আকৃষ্ট ছিল, সে ঐ লোকটির প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি, বরং বিরত ছিল।

যখন সে ব্যক্তির দেহে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে, তখন মৃত্যুশয্যায় সে এই কবিতাটি আবৃত্তি করে:

يَا أَسْلَمُ يَا رَاحَةَ الْعَلِيلِ ... وَيَا شِفَاء الْمُدْنَفِ النَّحِيلِ
رِضَاك أَشْهَى إِلَى فُؤَادِي ... مِنْ رَحْمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيلِ

(কবিতাটির ভাবানুবাদ) 'হে আসলাম! হে আমার অসুখী প্রাণের শান্তি! হে এই দুর্বল, রোগাক্রান্ত হৃদয়ের আরোগ্য! তোমার সন্তুষ্টি আমার হৃদয়ের কাছে সেই মহান সৃষ্টিকর্তার দয়ার চেয়েও প্রিয়!'[১৫]

সম্মানিত পাঠক! দেখুন, লোকটি দুনিয়াবি প্রেমে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ে যে, আল্লাহর রহমত থেকেও সে মানবিক প্রেমের তৃপ্তিকে প্রাধান্য দিতে থাকে। এটি মারাত্মক ধ্বংসাত্মক মানসিক অবস্থা, যার কারণে মানুষ ধীরে ধীরে ঈমান হারিয়ে ফেলে -না'ঊযুবিল্লাহি মিন যালিক-।

ঘটনা-৩: হাফেয ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ ক্বরা ইউসুফ নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, 'সে দাড়িগোঁফহীন এক সুদর্শন যুবকের দিকে ইশারা করে বলল, এটাই আমার ইলাহ, আমি যার উপাসনা করি। এটি পাথরের উপাসনার চেয়ে মন্দ কিছু নয়। তখন উপস্থিত একজন বলল, এমন কথা তো কুফরী। জবাবে সে বলল, যদি সে ইলাহ না-ও হয়, তবে সে ইলাহ-এর ভাই'।[১৬]

প্রিয় পাঠক! ভাবতে পারেন, জঘন্য পাপটি একজন মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে! -না'ঊযুবিল্লাহি মিন যালিক-।

ঘটনা-৪: হাফেয ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ ৮২৫ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ মাসের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'এ মাসে একজন অনারব ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে। ঘটনা হচ্ছে, সে একজন সুন্দর কিশোরকে ভালোবাসত, কিন্তু তাকে পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। একসময় এমন এক সুযোগ ঘটে গেল যে, সেই কিশোর নিজে থেকেই তার কাছে নিজেকে উপস্থাপন করল। কিন্তু সে যখন এগোতে গেল, তখন তার যৌনাঙ্গ উত্তেজিত হলো না। এতে সে এতটাই হতাশ হয়ে পড়ল যে, রাগ ও বেদনায় নিজের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলল। এরপর তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো, কিন্তু সেখানেই সে মারা গেল'।[১৭]

সম্মানিত পাঠক! এই জঘন্য কাজটির ভয়াবহ পরিণতি কতটা মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক হতে পারে, তা এই ঘটনা থেকে সহজে অনুমেয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। তাই প্রতিটি পিতা-মাতা ও অভিভাবকের উচিত, তাদের সন্তানদের সতর্ক করা, যেন তারা তাদের চেয়ে বয়সে বড়দের সঙ্গে অযথা না বসে এবং যেন তারা বুদ্ধিহীন লোকদের সঙ্গেও না বসে, যদিও তারা সমবয়সী হয়। তেমনি যুবকদের জন্যও জরুরী হচ্ছে, তারা সুন্দর চেহারার কিশোরদের (যাদের প্রতি ফেতনার ভয় থাকে) বন্ধু না বানায়, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা না করে এবং একান্তে সময় না কাটায়। কারণ এগুলো ফেতনার দরজা খুলে দেয় এবং সাধারণত শয়তান এই ধরনের নির্জনতা ও সান্নিধ্যের মাঝেই প্রবেশ করে আর তার ফাঁদ পাতে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

সমলিঙ্গের প্রতি আসক্তি সমকামিতার প্রধান ফটক: কোনো সমাজে সমকামিতা তখনই ছড়িয়ে পড়ে, যখনই মানুষ সুন্দর চেহারার লোকদের দেখা এবং তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করার ব্যাপারে অসতর্ক হয়ে পড়ে। একারণে ইসলামের বড় বড় আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, কোনো কমবয়সী দাড়িহীন ছেলের দিকে যৌন চাহিদা নিয়ে তাকানো সম্পূর্ণ হারাম। এমনকি বেশিরভাগ আলেম বলেছেন, যদি তাকানোর কারণে শরীরে যৌন অনুভূতি জাগার আশঙ্কা থাকে, তাহলেও তাকানো হারাম। আর কেউ কেউ বলেছেন, যৌন অনুভূতির ঝুঁকি না থাকলেও এমন ছেলের দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকা উচিত।[১৮]

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

---

১৫. কুরতুবী, আত-তাযকিরা বিআহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ (রিয়াদ: মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, ১৪২৫ হি.), পৃ. ১৯৫; ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাওয়াইশ-শাফী (মরক্কো: দারুল মা'রেফাহ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ১৬৮।

১৬. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইম্বাউল গুম্র বিআম্বাইল উম্র (মিশর: লাজনাতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ খৃ.), ৩/২৩৩।

১৭. প্রাগুক্ত, ৩/২৭৩।

১৮. দেখুন: https://islamqa.info/ar/answers/316186/

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

(মিন্নাতুল বারী-৬ষ্ঠ পর্ব)

بَابُ قَوْلِ المُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا.

পরিচ্ছেদ: ৩/৪. মুহাদ্দিছের 'হাদ্দাছানা', 'আখবারানা' ও 'আম্বাআনা' বলা:

وَقَالَ لَنَا الحُمَيْدِيُّ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا، وَسَمِعْتُ وَاحِدًا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ وَقَالَ شَقِيقٌ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَلِمَةً وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.

হুমায়দী আমাদের বলেছেন, 'ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, হাদ্দাছানা (আমাদের বর্ণনা করেছেন), আখবারানা (আমাদের খবর দিয়েছেন), আম্বাআনা (আমাদের সংবাদ দিয়েছেন), সামি'তু (আমি শুনেছি)—এই চারটি শব্দ একই অর্থবোধক'। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, 'আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাদীছ শুনিয়েছেন, যিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত হিসেবে স্বীকৃত'। শাক্বীক্ব রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসঊদ) রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বলেন, 'আমি আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-থেকে একটি বাক্য শুনেছি'। হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, 'আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু দুটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন'। আবুল আলিয়া বলেন, 'ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর রব عز وجل থেকে বর্ণনা করেছেন'। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, 'নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর রব عز وجل থেকে বর্ণনা করেছেন'। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, 'নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর রব عز وجل থেকে বর্ণনা করেছেন'।

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

(১) হুমায়দী: তার পরিচয় পূর্বে চলে গেছে।

(২) ইবনু উয়াইনা: তার পরিচয় পূর্বে চলে গেছে।

(৩) ইবনু মাসঊদ: তার পরিচয় পূর্বে চলে গেছে।

(৪) শাক্বীক্ব: শাক্বীক্ব ইবন সালামা আবূ ওয়ায়েল আল-আসাদী (شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي)।

মৃত্যু: আনুমানিক ৮০-৯০ হিজরীর মধ্যে।

পরিচয়: তিনি কূফার প্রসিদ্ধ তাবেঈ এবং ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর শিষ্য এবং বিশ্বস্ত রাবী। অধিকাংশ প্রবীণ ছাহাবী থেকে হাদীছ শুনেছেন। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে তার বহু বর্ণনা আছে।[১]

(৫) হুযায়ফা: তার পূর্ণ নাম হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান। তবে তার পিতার প্রকৃত নাম হুসাইল ইবন জাবের। আবার এটাও বলা হয় যে, তাঁর পিতা হাসাল ইবন জাবের। তিনি তার গোত্রে একটি হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে নিজ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় নেন। মদীনার আনছারী গোত্র বানূ আব্দিল আশহালের সাথে তার বন্ধুত্বের চুক্তি হয়। আর বানূ আব্দিল আশহাল যেহেতু ইয়ামান থেকে আগত গোত্র ছিল, তাই তাদের দিকে সম্বন্ধিত করে তাকে ইয়ামান নামে ডাকা শুরু হয়। হুযায়ফা ও তার পিতা ইয়ামানের পক্ষে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কেননা আবূ জাহল তাদেরকে এই শর্তে ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। মদীনায় এসে তারা আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে এই চুক্তির কথা জানান এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চান। তখন আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ 'তোমরা দু'জন ফিরে যাও। আমরা তাদের সাথে চুক্তি পূর্ণ করব। আর আমরা তাদের বিপরীতে আল্লাহর সাহায্য কামনা করি'।[২] তবে পরবর্তীতে তারা উভয়ে উহুদ যুদ্ধে শরীক হন এবং তার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সর্বদা অকল্যাণ ও ফেতনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনেক গোপন কথা তাঁকে বলে গিয়েছেন। তার নিকট মুনাফেক্বদের তালিকা ছিল। উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তাকে মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

মৃত্যু: উছমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর মৃত্যুর ৪০ দিন পর ৩৬ হিজরীতে মাদায়েন শহরে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩]

(৬) আবুল আলিয়া: আবুল আলিয়া ও তার পরিচয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেননা আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা-এর দুইজন ছাত্র আবুল আলিয়া নামে প্রসিদ্ধ।

প্রথম মত: রুফাই ইবন মিহরান আর-রিয়াহী (رُفَيْعُ بنُ مِهْرَانَ الرِّيَاحِيُّ)। তার মৃত্যু হয় আনুমানিক ৯০ হিজরীতে। তিনি তাবেঈ এবং ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা সহ অনেকের ছাত্র। তিনি জাহেলী যুগ পেয়েছিলেন, তবে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর দুই বছর পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাবেঈদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা তাকে অনেক সম্মান

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/১৬১।
২. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৩৫৪।
৩. তাহযীবুল কামাল, ৫/৪৯৭।

করতেন। একদিন তিনি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মজলিসে প্রবেশ করলে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে বিছানায় বসতে দিলেন। অথচ অনেক কুরাইশ বংশের ছাত্র মেঝেতে বসেছিলেন। তখন ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘এই জ্ঞান এমন জ্ঞান, যা মর্যাদাবানের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় এবং ক্রীতদাসদের সম্মানের আসনে বসিয়ে দেয়’।[৪]

দ্বিতীয় মত: যিয়াদ ইবন ফায়রূয আল-বারা (زِيَادُ بْنُ فَيْرُوزَ الْبَرَاء)। তীর নির্মাণে পারদর্শী হওয়ায় তাকে البراء বলা হতো। তিনিও ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর ছাত্র। কারো কারো মতে, তিনি এই হাদীছের রাবী।

সঠিক মত: অধিকাংশ মুহাদ্দিছের মতে, এই হাদীছের রাবী হচ্ছেন, রুফাই ইবন মিহরান আর-রিয়াহী। ইমাম মিযযী তার তুহফাতুল আশরাফে আবুল আলিয়া রুফাই থেকে বর্ণিত হাদীছগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম শু‘বার একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন,

قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ. وَحَدِيثُ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ

ইমাম শু‘বা বলেন, ‘ক্বাতাদা আবুল আলিয়া থেকে কেবল চারটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। একটি ইউনুস ইবন মাত্তার হাদীছ, একটি ছালাতের বিষয়ে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাদীছ, একটি ‘বিচারক তিন ধরনের...’ হাদীছ আর সর্বশেষটি ইবনু আব্বাসের হাদীছ- আমার কাছে কিছু সন্তোষজনক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছেন...’।[৫]

উক্ত বক্তব্যে ইউনুস ইবন মাত্তার যে হাদীছের কথা বলা হয়েছে, সেটিই ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আবুল আলিয়ার সনদে এই অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং রুফাই ইবন মিহরান আর-রিয়াহীই উক্ত আবুল আলিয়া।

এছাড়া আবুল আলিয়া আল-বারা বর্ণিত শুধু একটি হাদীছ কুতুবে সিত্তাহতে বর্ণিত আছে। হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে ‘হজ্জ’ অধ্যায়ে এসেছে।[৬]

শিরোনামের তাৎপর্য:

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এই শিরোনামের মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দাবলির প্রয়োগ ও পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর উক্ত শিরোনামের মৌলিক উদ্দেশ্য নিম্নরূপ—

(১) হাদীছ শ্রবণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণের নিজস্ব কিছু পরিভাষা আছে। সেই পরিভাষাগুলো নবাবিষ্কৃত নয়; বরং সেগুলো যে ছাহাবী ও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, সেটা তুলে ধরেছেন।

(২) পরিভাষাগুলোর মধ্যে তেমন কোনো ব্যবহারিক পার্থক্য নেই।

(৩) ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ-এর এই গ্রন্থের সকল হাদীছ এই পরিভাষাগুলো দিয়েই বর্ণিত হয়েছে তথা তাঁর ছহীহ বুখারীতে বিচ্ছিন্ন কোনো হাদীছ নেই।

হাদীছের ব্যাখ্যা:

উক্ত আলোচনাটি বুঝতে হলে আমাদেরকে পূর্বে সামগ্রিকভাবে হাদীছ শ্রবণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণের পরিভাষাগুলো জেনে নিতে হবে, যথা—

হাদীছ গ্রহণের শব্দরূপসমূহ (صيغ التحمل): تَحَمُّل অর্থ হাদীছ শোনা বা গ্রহণ করা। আর মানে হাদীছ শোনার বা গ্রহণ করার শব্দরূপসমূহ। কোন ছাত্র কীভাবে হাদীছ শায়খের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন, তার ধরন বোঝাতেই তাহাম্মুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। এর প্রধানত ৮টি পদ্ধতি রয়েছে। যথা—

১. শোনা (السماع): ছাত্র সরাসরি শায়খের মুখ থেকে হাদীছ শুনলে এটি ব্যবহার করা হয়। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী পদ্ধতি।

২. শায়খকে পাঠ করে শুনানো (القراءة على الشيخ): ছাত্র বা অন্য কেউ পড়ে শুনিয়েছেন, শায়খ তা শুনেছেন এবং অনুমোদন দিয়েছেন। বর্তমান দারসগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্র পড়েন, অন্য ছাত্ররা শোনেন এবং শিক্ষকও শোনেন।

৩. অনুমতি (الإجازة): শায়খ সরাসরি হাদীছ না বললেও অথবা ছাত্র শিক্ষকের সামনে না পড়লেও ছাত্রকে কোনো কিতাব বা হাদীছ বর্ণনার মৌখিক বা লিখিত অনুমতি দেওয়া হয়। এটাই হচ্ছে ‘ইজাযা’ বা অনুমতি।

৪. হস্তান্তর (المناولة): শায়খ ছাত্রকে হাদীছের পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলেন, এটা থেকে তুমি বর্ণনা করতে পার।

৫. চিঠির মাধ্যমে (المكاتبة): শায়খ ছাত্রকে চিঠিতে হাদীছ লিখে পাঠালে এটি ব্যবহার করা হয়।

৬. জানিয়ে দেওয়া (الإعلام): শায়খ তার ছাত্রকে জানান যে, এই হাদীছ বা এই কিতাব তিনি নির্দিষ্ট কোনো শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন অথবা এগুলো তার শ্রবণকৃত হাদীছ অথবা এগুলো তার সংকলন। কিন্তু তিনি তার থেকে সেগুলো বর্ণনা করার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে অনুমতি প্রদান করেন না।

৭. অছিয়ত বা উইল করা (الوصية): শায়খ মৃত্যুর আগে বলেন, ‘আমি এই কিতাব বা এই হাদীছ আমার পক্ষ থেকে অমুক ছাত্রকে বর্ণনা করার অছিয়ত করছি’।

৮. হাদীছ বর্ণনা করার শব্দরূপসমূহ (صيغ الأداء): حدثنا (হাদ্দাছানা)- সরাসরি শুনলে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। أخبرنا (আখবারানা)- শায়খের সামনে পাঠ করা হলে এটি ব্যবহৃত হয়। أنبأنا (আম্বাআনা)- সাধারণত ইজাযাত বা মুকাতাবার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

৪. তাহযীবুল কামাল, ৯/২১৭।
৫. তুহফাতুল আশরাফ, ৪/৩৮৫।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/১০৮৫।

ইসলামের দৃষ্টিতে বায়তুল মাক্বদিস: মর্যাদা, গুরুত্ব ও ফযীলত

*-মাহবূবুর রহমান মাদানী**

ভূমিকা: বায়তুল মাক্বদিস ফিলিস্তীনের জেরুজালেমের পুরনো শহরে অবস্থিত। এটা মুসলিমদের প্রথম কিবলা। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে মক্কার হারাম থেকে আল-আক্বছা মসজিদে এসেছিলেন এবং এখান থেকে তিনি ঊর্ধ্বাকাশে যাত্রা করেন। আর মি'রাজের পূর্বে তিনি সকল নবীকে সঙ্গে নিয়ে নিজ ইমামতিতে ছালাত আদায় করেন। তবে মক্কা-মদীনার মতো এতে 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ এলাকা নেই। ফিলিস্তীন বহু নবীর জন্মস্থান হওয়ার কারণে বহুপূর্ব থেকেই বায়তুল মাক্বদিস মুসলিশ, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের অতি আগ্রহের স্থান। বর্তমানে বায়তুল মাক্বদিসকে ঘিরে অভিশপ্ত ইয়াহূদী জাতি আবারো ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে আলোচনা সময়ের দাবি।

নামকরণের কারণ: আক্বছা অর্থ দূরবর্তী। যেহেতু এটি মসজিদুল হারাম থেকে দূরে অবস্থিত, তাই একে মসজিদুল আক্বছা বলা হয়।

বায়তুল মাক্বদিসের মর্যাদা: বায়তুল মাক্বদিসের মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

'তিনি সেই পূত-পবিত্র সত্তা, যিনি তাঁর প্রিয় বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি। তাকে আমার নিদর্শনাবলি দেখানোর জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(আল-ইসরা, ১৭/১)*। বরকতের কারণ হতে পারে—

(১) এ অঞ্চলটি ইবরাহীম, লূত, ইয়াকুব, দাঊদ, সুলায়মান ও ঈসা আলাইহিস সালাম প্রমুখ অসংখ্য নবী-রাসূলের জন্মস্থান, বাসস্থান, কর্মস্থল ও মৃত্যুস্থান। মূসা আলাইহিস সালাম -এর মৃত্যুও এখানে হয়।

(২) এই এলাকাটি উর্বর, সুষম আবহাওয়া, গাছগাছালি, নদনদী, ঝরনা, প্রাচুর্য, ফলমূল, শস্য ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ।[১] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, وَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدَ الْحَرَامِ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ وَمَسْجِدَ الْمَقْدِسِ وَالطُّورِ 'দাজ্জাল সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করবে কিন্তু চারটি মসজিদের নিকটবর্তী হতে পারবে না— বায়তুল্লাহ, মসজিদে নববী, বায়তুল মাক্বদিস ও মসজিদে তূর'।[২]

যুগে যুগে বায়তুল মাক্বদিসের সংস্কার ও অবস্থা: বায়তুল মাক্বদিস সর্বপ্রথম নির্মিত হয় ফেরেশতা অথবা আদম আলাইহিস সালাম -এর কোনো এক সন্তানের মাধ্যমে কা'বাঘর নির্মাণের ৪০ বছর পর। এরপর ইয়াকূব আলাইহিস সালাম স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তা পুনঃনির্মাণ করেন। এর প্রায় ১ হাজার বছর পর দাঊদ আলাইহিস সালাম পুনঃনির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন এবং তদীয় পুত্র সুলায়মান আলাইহিস সালাম -এর হাতে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ দাঊদ আলাইহিস সালাম মূল নির্মাণ কাজ শেষ করলেও আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনো বাকী থেকে যায়। তাই সুলায়মান আলাইহিস সালাম অবশিষ্ট কাজে হাত দেন। এই কাজগুলো অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের উপর ন্যস্ত ছিল। তারা তাঁর ভয়ে কাজ করত। এদিকে সুলায়মান আলাইহিস সালাম -এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ অসম্পূর্ণ রেখে পলায়ন করত। বিধায় সুলায়মান আলাইহিস সালাম মৃত্যুপ্রস্তুতি গ্রহণ করে কাচনির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করেন যাতে বাহির থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা যায়। তিনি নিয়মানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে রূহ বের হয়ে যাওয়ার পরও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় সেটাই ঘটল। আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দেহ লাঠিতে ভর করে এক বছর দাঁড়িয়ে থাকল। দেহ পচলও না, পড়লও না। জিন ভয়ে তাঁর কাছে যায়নি। ফলে তারা দিনরাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কাজ শেষ করে ফেলল। কাজ সম্পন্ন হলে আল্লাহর আদেশে উইপোকার সাহায্যে লাঠি ভেঙে দেওয়া হয় এবং সুলায়মান আলাইহিস সালাম -এর

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

২. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৭৫০৬; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৯৩৪, এর রাবীগণ 'ছিক্বাহ'।

লাশ মাটিতে পড়ে যায়। এ ঘটনা মহান আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন *(সাবা, ৩৪/১৪)*।

প্রাক-ইসলাম যুগে ইয়াহূদীরা নবী ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম)-কে হত্যা করলে নাছারারা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের বাবেল শহরের একজন অগ্নিউপাসক সম্রাট বুখতে নছরের সাথে মিলিত হয়ে ইয়াহূদীদের উপর আক্রমণ চালায়। তারা সেখানে হত্যা, লুণ্ঠন চালিয়ে তাওরাতের কপিসমূহ পুড়িয়ে দেয়, বায়তুল মাক্বদিসের অভ্যন্তরে ময়লা-আবর্জনা ও শূকর নিক্ষেপ করে এবং মসজিদের প্রাচীর ক্ষতবিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জনমানবহীন করে দেয়। এতে ইয়াহূদীদের শক্তি খর্ব ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ পর্যন্ত বায়তুল মাক্বদিস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর খেলাফতকালে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তাঁর নির্দেশক্রমে বায়তুল মাক্বদিস পুনঃনির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘ সময় সমস্ত সিরিয়া ও বায়তুল মাক্বদিস মুসলিমদের অধিকারে থাকে। এই সময়ে বিভিন্ন মুসলিম বাদশার শাসনামলে আল-আক্বছা মসজিদটির সংস্কার সাধিত হয়। ৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে খলীফা আব্দুল মালেক মসজিদ সম্প্রসারণ করেন এবং কুব্বাত আস-সাখরা (সোনালি গম্বুজওয়ালা স্থাপনা) নির্মাণ করেন। অতঃপর বায়তুল মাক্বদিস মুসলিমদের হস্তচ্যুত হয় এবং দীর্ঘ ৯০ বছর ইউরোপীয় নাছারাদের অধিকারে ছিল। অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ শতকে সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী ১১৮৭ সালে বায়তুল মাক্বদিস পুনরুদ্ধার করেন। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেডার খ্রিষ্টানরা জেরুজালেম দখলের পর মসজিদটিকে প্রাসাদ এবং প্রাঙ্গণে থাকা কুব্বাতুছ ছখরা-কে গির্জা হিসাবে ব্যবহার করত। অতঃপর সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের পর একে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার শুরু করেন। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহূদী কর্তৃক জেরুজালেম জবরদখলের পর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর ইসরাঈলী পুলিশ এই প্রথম আল-আক্বছা মসজিদে প্রবেশ করে। বর্তমানে পুরনো শহরগুলো ইসরাঈলী বাহনীর নিয়ন্ত্রণে আছে। তবে মসজিদটি ফিলিস্তীনী নেতৃত্বাধীন ইসলামী ওয়াক্বফের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

বায়তুল মাক্বদিসে ছালাত আদায়ের ফযীলত: আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى ‘তিনটি মসজিদ ব্যতীত কেউ অন্য কোনো স্থানে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না— ১. মসজিদুল হারাম, ২. মসজিদে নববী এবং ৩. মসজিদুল আক্বছা’।[৩] একদা আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, বায়তুল মাক্বদিসে ছালাত আদায় করা উত্তম, না-কি মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করা উত্তম? তখন তিনি বললেন, صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ ‘বায়তুল মাক্বদিসে ছালাত আদায়ের মর্যাদা আমার এই মসজিদে ছলাতের এক-চতুর্থাংশ’।[৪] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) যখন বায়তুল মাক্বদিস তৈরির কাজ শেষ করেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেন— ১. সুবিচার, যা আল্লাহর হুকুমের অনুরূপ, ২. এমন রাজত্ব, যা তাঁর পরে কাউকে দেওয়া হবে না এবং ৩. যে ব্যক্তি বায়তুল মাক্বদিসে শুধু ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে আসবে, সে যেন তার গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায় সে দিনের মতো যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল সেরূপ। এরপর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘প্রথম দুটি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আশা করি তৃতীয়টিও তাঁকে দান করা হবে’।[৫]

উপসংহার: বায়তুল মাক্বদিস ইসলামের ইতিহাস, বিশ্বাস ও ইবাদতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি মুসলিমদের প্রথম কিবলা, মি‘রাজের গুরুত্বপূর্ণ স্তর এবং বহু নবীর স্মৃতিধন্য ভূমি। কুরআন ও হাদীছে এর ফযীলত ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যুগে যুগে এই পবিত্র ভূমি বহুবার ধ্বংস-সংস্কারের মধ্য দিয়ে গেলেও মুসলিমরা এর রূহানী মহিমা রক্ষা করে চলেছে। আজকের প্রেক্ষাপটে ইয়াহূদীদের অব্যাহত দখলদারিত্বের মুখে মুসলিম উম্মাহর উচিত— বায়তুল মাক্বদিসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর রক্ষণাবেক্ষণ ও মুক্তির জন্য দু‘আ ও সচেতন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

---

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১১৮৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৯৭।

৪. শুআবুল ঈমান বায়হাকী, হা/৩৮৪৯ ‘ছহীহ সনদ’; মাওসু‘আতুল ই‘তিকাদ আলবানী, ২/২৫৩।

৫. ইবনু মাজাহ, হা/১৪০৮।

টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করার ভয়াবহতা

*-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস**

মুসলিম মাত্রই সব ধরনের পাপ থেকে বেঁচে থাকবে। যদিও তা নিজের কাছে তুচ্ছ মনে হয়। আজকে আমরা এরকমই একটি ভয়াবহ পাপ নিয়ে কথা বলব ইনশা-আল্লহ।

অধিকাংশ জায়গার পরিবেশ অনৈসলামিক হওয়ায় ছোট থেকে বড়, অশিক্ষিত থেকে উচ্চ শিক্ষিত পর্যন্ত এই পাপটি অনায়াসেই করে থাকেন। তারা এটিকে তেমন কিছুই মনে করেন না। তবে কেউ যদি তাকে এ বিষয়ে উপদেশ দেন, তাহলে তাকে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে উড়িয়ে দেন। অনেকে বলে, এটি করলে ঠ্যাঙা ঠ্যাঙা লাগে। অনেকে বলে, তুমি এখনো সেকেলে বা আগের যুগের মানুষ হয়ে থেকে গেলে, আধুনিকতার কিছুই বুঝো না। আবার অনেকে এটিকে হেয়ভাবে দেখে। জানেন কি? সেই ছোট পাপটি কি? জি, কমবেশি সবারই জানা। সেটি হলো পুরুষ মানুষের টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা, হতে পারে সেটা প্যান্ট, পায়জামা, জোব্বা বা যেকোনো পোশাক। যারা টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান করে আধুনিক যুগের কিছু মানুষ তাদের হেয় প্রতিপন্ন করে।

প্রিয় ভাই! আপনি একজন মুসলিম হিসেবে আপনার প্রথম কাজ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামাআতের সাথে আদায় করা। যার অবাধ্যতার ভয়াবহতা অনেক কঠিন।[১] আপনাকে যখন মসজিদে কাতারবন্দী অবস্থায় দেখি যে, সকল প্রকার ভেদাভেদ দূর করে সবাই একই কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন, তখন হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করি।

কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখি যে, আপনি বা আপনার মতো শিক্ষিত মানুষগুলো ছালাত শেষ করে মসজিদ হতে বের হয়ে, কেউবা মসজিদের ভিতরেই প্যান্ট বা পায়জামা টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে দেয়, তখন সেই বুকভরা আনন্দটা ম্লান হয়ে আফসোসে বুক ফেঁটে যায়!

প্রিয় মুসলিম ভাই! ছালাতে ওয়াদা করলাম কী, আর এখন করছিটা কী? ছালাত শেষ হতে না হতেই ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের অনুসরণ শুরু করে দিলাম। আপনি কখনো ভয়াবহতা সম্পর্কে চিন্তা করেছেন কি? আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

‘যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার ও শপথসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোনো অংশে নেই। আর তাদের সাথে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে (পাপ থেকে) পবিত্র করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ *(আলে ইমরান, ৩/৭৭)*।

চলুন, নবী ﷺ-এর মুখ থেকে শুনে নিই।

যেই স্টাইলে পোশাক পরাকে আপনি আধুনিকতা মনে করছেন নবী ﷺ যখন এর ভয়াবহতা উল্লেখ করলেন, তখন আবূ যার বললেন, তারা কারা? নবী ﷺ বললেন, এরা হলো— (ক) যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, (খ) যে ব্যক্তি নিজের পণ্য বেশি বিক্রয় করার নিমিত্তে মিথ্যা কসম করে এবং (গ) যে ব্যক্তি দান করার পর খোঁটা দেয়।[২]

প্রিয় ভাই! চিন্তা করে দেখুন তো, আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় ১০০ রহমত সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে একটি দয়া পুরো সৃষ্টিজগতের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন। বাকি ৯৯টি দয়া তিনি নিজের কাছে রেখেছেন। এটা দিয়ে তিনি বিচারের মাঠে তার বান্দাদের ক্ষমা করবেন।[৩] যার একেকটা দয়ার পরিধি হচ্ছে আসমান-যমীন সমতুল্য।[৪] এরপরও যদি বিচারের মাঠে আল্লাহ সামান্য (!) টাখনুর নিচে কাপড় পরার কারণে তার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে না তাকান! তাহলে বলেন, এ ব্যক্তি কত বড় হতভাগা! অথচ এই পাপের কারণে রোজ হাশরে আপনাকে আমাকে কঠিন ভয়াবহ জাহান্নামে যেতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘সেদিন যালেম তার হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায়! যদি আমি রাসূলের সাথে সৎপথ গ্রহণ করতাম, হায়! আমার দুর্ভোগ! যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৭-২৮)*।

কোথায় হবে তার অবস্থান? একটিবারও কি ভেবে দেখেছেন? অথচ আপনি এটাকে খুব হালকাভাবে দেখেন।

---

* বিএ, অনার্স, হাদীছ বিভাগ, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৪; মিশকাত, হা/১০৫৩।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/১০৬; আবূ দাঊদ, হা/৪০৮৭; তিরমিযী, হা/১২১১।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬০০০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৫২।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৫৩।

একবার টাখনুর নিচ থেকে টাখনুর উপরে কাপড় উঠাতে শতবার চিন্তা করতে হয়। বন্ধুবান্ধব কী বলবে! মানুষ বলবে শিক্ষিত হয়ে আজও সেকেলে হয়ে আছো?

দেখুন, আপনি বন্ধুবান্ধব আর বড় বড় শিক্ষিত, আত্মীয়স্বজনের কথা চিন্তা করছেন? অথচ এরা কেউ ক্বিয়ামতের মাঠে আপনার উপকারে আসবে না। কেউ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। সবাই আপনাকে দেখে পরিচয় গোপন করে পালিয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ﴾ 'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে, তার মাতা ও পিতা হতে, তার স্ত্রী ও সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন কঠিন অবস্থা হবে, যা তাকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রাখবে' *(আবাসা, ৮০/৩৪-৩৭)*।

প্যান্ট, লুঙ্গি, পায়জামা, জামা ও পাগড়ি সবগুলোর ক্ষেত্রে একই বিধান তথা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ি ঝুলিয়ে পরার ব্যাপারে বলেন, اَلْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি অহংকারবশত উপরের কোনো একটি পোশাক ঝুলিয়ে পরিধান করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না'।[৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লুঙ্গি সম্পর্কে যা বলেছেন, জামা সম্পর্কেও তাই বলেছেন।[৬]

আপনি মনে করছেন, হাদীছে যেহেতু 'অহংকার'-এর কথা বলা হয়েছে। আর আমি তো অহংকার করে টাখনুর নিচে কাপড় পরছি না। আমরা এমনিতেই পরে থাকি!

জি, প্রিয় ভাই! বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়তোবা আপনার কথা ঠিক আছে। কিন্তু আপনার এই যুক্তিই হলো খোঁড়া। এই যুক্তির সুযোগও ইসলামে রাখা হয়নি। কেননা ইসলামের বিধিবিধান অবজ্ঞা করা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করাই মূলত অহংকার। কিন্তু আপনি এখনো বুঝতে পারেননি যে, টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা মানেই অহংকার করা।[৭] এজন্য মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ﴾ 'তুমি গর্ব করে পৃথিবীতে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না' *(লুক্বমান, ৩১/১৮)*। তাইতো রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো এক সময়ে এক ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করত। তাই তাকে যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের মধ্যে ধসতে থাকবে'।[৮]

এখানে আরও একটি ভয়াবহতা হলো— 'যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন এক ব্যক্তি বললেন, কেউ তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক ভালো হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এটাও কি অহংকার? তিনি বললেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো, হক্বকে অহংকার করে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে হীন ও তুচ্ছ মনে করা'।[৯] এজন্য কোনো মুসলিম পুরুষের জন্য টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা সর্বাবস্থায় হারাম।

টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারীর শেষ ঠিকানা জাহান্নাম:

প্রিয় ভাই আমার! এখনো মাঝেমাঝে লক্ষ করি যে, কোনো নোংরা, ময়লা বা কাদাযুক্ত পানি পার হলে আপনি ঠিকই প্যান্ট-পায়জামা টাখনুর উপরে উঠিয়ে ভাঁজ করে নেন। বুঝে নিন, আপনি পানি ও কাদাকে ভয় করে এ কাজ করেছেন, আল্লাহকে ভয় করে নয়। জেনে রাখুন, যে সকল ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, তাদের শেষ পরিণাম খুবই ভয়াবহ। তাদের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এ মর্মে আপনার আমার দয়ার নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ يَقُوْلُ ثَلَاثًا 'কাপড় টাখনুর নিচে যে পরিমাণ যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে। একথা তিনি তিনবার বলেছেন'।[১০]

প্রিয় ভাই আমার! ইতোমধ্যে হয়তো আপনি চিন্তা করে ফেলেছেন যে, 'টাখনুর নিচের অংশ জাহান্নামে যাবে' বাকি

---

৫. আবূ দাঊদ, হা/৪০৯৪; নাসাঈ, হা/৫৩৩৪; ইবনু মাজাহ, হা/৩৫৭৬।
৬. আবূ দাঊদ, হা/৪০৯৫; আহমাদ, হা/৬২২০; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/৬১৩২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২০৩০, সনদ ছহীহ।
৭. আবূ দাঊদ, হা/৪০৮৪।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/২০৮৮।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৯১; আবূ দাঊদ, হা/৪০৯২; আহমাদ, হা/৩৭৮৯।
১০. আবূ দাঊদ, হা/৪০৯৩; ইবনু মাজাহ, হা/৩৫৭৩।

অংশ তো আর যাবে না, তাহলে সমস্যা কী? এখনো আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি। এটি বুঝতে হলে একটি উদাহরণ লক্ষ করুন। ধরুন, আপনি বিদ্যুৎ বোর্ডের সকেটের দুই ছিদ্রে আঙুল দিয়েছেন। বলেন তো এখন কি শুধু আপনার আঙুলেই শক লাগবে নাকি পুরো শরীরে শক লাগবে? আশা করছি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনাকে দীর্ঘ চিন্তা করতে হবে না। তবে আমি শুধু একটি উদাহরণ দিলাম মাত্র। যা বাস্তবতায় অনেক কঠিন। এজন্য নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার পর্যন্ত বলতেই থাকলেন। অথচ আমরা এটাকে গুরুত্ব দিতে চাই না। তবে এটি বুঝতে আপনার সামনে আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করছি, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ مَا يُرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا 'জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে কম আযাব হবে ঐ লোকের, যাকে আগুনের ফিতাসহ একজোড়া জুতা পরানো হবে। তাতে তার মগজ এমনিভাবে ফুটতে থাকবে, যেমনভাবে তামার পাত্রে পানি ফুটতে থাকে। সে ধারণা করবে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ সে হবে সবচেয়ে কম ও সহজ শাস্তিপ্রাপ্ত লোক'।[১১]

উপরন্তু উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, এখানে শরীরের যেই অংশে আল্লাহর নাফরমানী করা হয়েছে, সেটা উল্লেখ করে পুরো শরীর উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।[১২]

ছালাতে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী থেকে আল্লাহ দায়িত্বমুক্ত:

টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারীকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন না। তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। ঐ ব্যক্তির ছালাত ত্রুটিপূর্ণ। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِيْ صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ 'যে ব্যক্তি ছালাত অবস্থায় স্বীয় কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরবে, তবে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করা বা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা, কোনোটাই করবেন না'।[১৩]

বুঝা গেল, কোনো ব্যক্তি ছালাত অবস্থায়ও যদি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, তাহলে মহান আল্লাহর দায়িত্ব তার উপর থেকে উঠে যায়। আর এ অবস্থায় সে মারা গেলে তাকে জান্নাতে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ নিবেন না। বিধায় এমন জঘন্য স্বভাব পরিহার করা জরুরী।

প্রিয় ভাই! আপনার সাথে আমার একটু জরুরী কথা হলো, আপনি ছালাতে যাওয়ার আগে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করেছিলেন। এখন যখন ছালাতে যাচ্ছেন, তখন কাপড় উঠিয়ে নিলেন, এটা কেন? এ অবস্থায়ও তিনি দেখেন বলেই তো রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাতে কাপড় গুটাতে নিষেধ করেছেন।[১৪] তাহলে এখন সমাধান কী? জি, সমাধান হলো আপনার প্যান্ট-পায়জামা টাখনুর উপরে ধরে কেটে নিতে হবে।

একজন পুরুষ কতটুকু কাপড় ঝুলিয়ে পরতে পারবে:

একজন পুরুষ মানুষ স্বীয় পরিধেয় কাপড় কতটুকু ঝুলিয়ে পরতে পারবে, তাও ইসলামে বলে দেওয়া হয়েছে। হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার অথবা তাঁর নিজের পায়ের নলার মাংসপেশির নিচের অংশে ধরে বললেন, هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ 'এ পর্যন্ত হলো লুঙ্গি পরার স্থান। তা যদি মানতে না চাও, আরও নিচে পরো। তারপর তুমি যদি মানতে না চাও, তাহলে আরও নিচে পরো। তাও যদি মানতে না চাও, তবে জেনে রেখো টাখনুর নিচে লুঙ্গি পরার অধিকার তোমার নেই'।[১৫] 'লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পায়ের নলার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত থাকা উচিত, যেখানে মাংসপেশি অবস্থিত। যদি তা পছন্দ না হয়, তবে আরও কিছু নিচে পরতে পারো। যদি আরও নামাতে চাও তাহলে আরও কিছু নিচে নামাতে পারো। আর যদি তাও পছন্দ না করো, তবে মনে রেখো! টাখনুর নিচে নামানোর অধিকার কারও নেই'।[১৬]

একজন পুরুষ তার পরিধেয় কাপড় সর্বনিম্ন টাখনু পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরতে পারবে। টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরার কোনো সুযোগ নেই। সর্বাবস্থায় তাকে টাখনুর উপরে উঠিয়ে রাখতে হবে। তা

---

১১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৬১; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৩।

১২. ফাতহুল বারী, ১০/২৬৯।

১৩. আবূ দাঊদ, হা/৬৩৭, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২০৪১।

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৮০৯-৮১০; আবূ দাঊদ, হা/৮৮৯-৮৯০।

১৫. আবূ দাঊদ, হা/৪০৪০।

১৬. তিরমিযী, হা/১৭৮৩; নাসাঈ, হা/৫৩২৯; সনদ ছহীহ।

না হলে সে ইসলামে ঘোষিত হারাম কর্মে জড়িয়ে পড়বে। তবে বেখেয়ালে কোনো সময় কাপড় টাখনুর নিচে নেমে গেলে আর পরক্ষণে উঠিয়ে নিলে কোনো গুনাহ হবে না।[১৭]

মহিলারা কাপড় কতটুকু ঝুলিয়ে পরবে?

একজন মুসলিম মহিলা তাদের পরিধেয় বস্ত্র কতটুকু ঝুলিয়ে পরবে, তাও বলে দেওয়া হয়েছে। কোনো বিষয়ে ইসলামে অস্পষ্টতা রাখা হয়নি। উম্মে সালামা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মেয়েরা স্বীয় কাপড় কতটুকু ঝুলিয়ে পরবে? উত্তরে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, تُرْخِي شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ 'নারীরা অর্ধ হাত ঝুলিয়ে পরিধান করবে। আমি বললাম, এতে তো পা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তিনি বললেন, তাহলে সে একহাত পরিমাণ নিচে ঝুলিয়ে রাখবে; তার চেয়ে বেশি নয়'।[১৮]

প্রিয় বোন! এখন আপনার প্রশ্ন হবে যে, তাহলে তো পোশাকের নিচের অংশে নাপাকি লেগে যাবে। জি, এরও সমাধান আছে। এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মসজিদে যাওয়ার রাস্তাটি আবর্জনাপূর্ণ। সুতরাং বৃষ্টি হলে আমরা কী করব? তিনি বললেন, এর পরের রাস্তাটা কি এর চাইতে ভালো নয়? তখন মহিলাটি বললেন, হ্যাঁ, ভালো। তিনি বললেন, তাহলে এটা ওটার পরিপূরক। (অর্থাৎ এ রাস্তার ময়লা ঐ ভালো রাস্তায় দূর করে দিবে)'।[১৯]

উপরের হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, মুসলিম মহিলাদের কাপড় পদতালু পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরতে হবে। কেননা চলাফেরা করার সময় যেন তাদের পা প্রকাশিত না হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সময়ে মুসলিম মহিলাগণ ঠিক সেভাবেই কাপড় পরতেন। তাদের কাপড় মাটি হেঁচড়িয়ে চলত। যার দরুন অনেক সময় রাস্তার আবর্জনা লেগে যেত, যা হাদীছে স্পষ্ট বুঝা যায়। সাথে সাথে এটা প্রমাণিত হয় যে, তাদের কাপড় টাখনুর নিচ পর্যন্ত ঝুলে থাকত। তারা পদতালু বরাবর কাপড় পরিধান করতেন। বিধায় মুসলিম মহিলাদের উচিত পদতালু পর্যন্ত কাপড়ে আবৃত হয়ে চলাফেরা করা।

সুধী পাঠক! বর্তমানে অধিকাংশ পুরুষ টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে থাকে। প্যান্ট-পায়জামা ঝুলিয়ে পরে এমনকি অনেকে লুঙ্গিও টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরে। আরও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, অনেকে জুব্বা টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরে বেড়ায়। অথচ এ সকল বিষয় অপরাধের দিক দিয়ে সমান। যারা প্যান্ট পরে, তাদের কেউ এমন আছে- যারা ফ্যাশন করে টাখনুর উপরে কাপড় রাখে। আর কিছু আছে আল্লাহকে ভয় করে টাখনুর উপরে রাখে। আর অধিকাংশ টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরে। তবে এই অধিকাংশ মানুষের টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা দেখলে মনে হয় টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা ফরয। তাই এরা প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত মূল সতর। যা ঢেকে রাখা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কিছু মানুষ নাভি উন্মুক্ত করে টাখনু ঢাকা শুরু করেছে। আর মেয়েদের টাখনুর নিচ পর্যন্ত কাপড় পরিধান করতে বলা হয়েছে। সেখানে তারা অনেকে টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান করছে। নারী-পুরুষ উভয়েই ইসলামের বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত রয়েছে; এরা অভিশপ্ত।[২০]

পরিশেষে একটি হাদীছ বলে আলোচনা শেষ করছি। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيْدًا 'নিশ্চয়ই তোমাদের পিছনে রয়েছে ধৈর্যের যুগ। সে সময় যে ব্যক্তি সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে, সে তোমাদের সময়ের ৫০ জন শহীদের মর্যাদা পাবে'।[২১]

অতএব, যেকোনো বিধানকে খুঁটিনাটি বলে অবজ্ঞা করা যাবে না। বরং সেগুলো পালনে বাহ্যিকভাবে যেমন নানাবিধ উপকার রয়েছে, তেমনি অঢেল নেকীও রয়েছে। বর্তমান যুগের প্রত্যেক আমলের পাবন্দ ব্যক্তির জন্যই এই সুসংবাদ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং উক্ত গুনাহসহ সব ধরনের গুনাহ হতে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৬২; আবূ দাঊদ, হা/৪০৮৫; মিশকাত, হা/৪৩৬৯।

১৮. আবূ দাঊদ, হা/৪১১৭; মিশকাত, হা/৪৩৩৪, সনদ ছহীহ।

১৯. আবূ দাঊদ, হা/৩৮৩-৩৮৪; ইবনু মাজাহ, হা/৫৩১-৫৩৩; মিশকাত, হা/৫০৪, ৫১২।

২০. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৬; মিশকাত, হা/৪৪২৮।

২১. ছহীহুল জামে', হা/২২৩৪, সনদ ছহীহ।

গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি

*-সাঈদুর রহমান**

জাহেলী যুগের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি। তারা এ রোগে চরমভাবে আক্রান্ত ছিল। গোত্রের একজন কোনো অন্যায় কাজ করলে গোত্রের সকলে ওই কাজে চোখ বন্ধ করে ধাবিত হতো। যেমন- একটি উদাহরণ দেই, বাসুস যুদ্ধে ৭০ হাজার মানুষ হতাহত হয়। এই যুদ্ধটি ৪০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ঠুনকো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বানূ বকর গোত্রের কালেব নামক এক ব্যক্তি তার চারণভূমিতে কারও পশুচারণের অনুমতি নেই বলে ঘোষণা দেয়। ঘটনাক্রমে বানূ তাগলীবের হাসসাম উক্ত ঘোষণা সম্পর্কে অবগত ছিল না। সে তার উট উক্ত চারণভূমিতে ছেড়ে দেয়। এক মহিলা এই চারণভূমিটা দেখাশোনা করত। মহিলাটি উটের স্তন কেটে দেয়। দিন শেষে উটটি যখন মনিব হাসসামের কাছে পৌঁছে, তখন সে উটের এই অবস্থা দেখে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ফলে হাসসাম ও কালেবের গোত্র বানূ বকর ও বানূ তাগলীব নিজ নিজ গোত্রের লোকের সাহায্যে অগ্রসর হয় এবং উভয় গোত্রের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ বেঁধে যায়। ক্রমান্বয়ে আরবের অন্যান্য গোত্রও একে অন্যের সমর্থনে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। উভয় পক্ষ পরস্পর লুটতরাজ, মারামারি, কাটাকাটি ইত্যাদি করতে থাকে। অবশেষে দীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত বংশানুক্রমে প্রায় ৭০ হাজার লোক হতাহতের পর ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে হীরার সর্দার তৃতীয় মুনযিরের প্রচেষ্টায় উভয় পক্ষ এই যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি হয়।[১]

সুধী পাঠক! দেখলেন, জাহেলী যুগের মানুষ কতটা গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির রোগে আক্রান্ত ছিল। অথচ উচিত ছিল বিষয়টা খতিয়ে দেখে এর একটা সুরাহা করা, কিন্তু তা না করে সবাই গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির মোহে পড়ে অন্ধের ন্যায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের বর্তমান যুগে জাহেলী যুগের মতো গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি হয়ে থাকে। আপনি মনে করছেন, জাহেলী যুগের মানুষের মাঝে এই রোগ বিদ্যমান ছিল। আপনাকে এখন দেখিয়ে দিব কীভাবে আমরা স্বজনপ্রীতির জালে আবদ্ধ। আপনি একা একা আনমনে হাঁটছেন। মনটা ভীষণ ফুরফুরে। হঠাৎ একটা উঁচু আওয়াজ শুনতে পেলেন। স্বরটা খুবই পরিচিত লাগছে। আপনি দেখতে পেলেন আপনার চাচাতো ভাই ও আরেকজন ছেলে মারামারি লেগেছে। এজন্যই আপনার চাচাতো ভাই নিজেকে বাঁচানোর জন্য আপনাকে ডাকছে। ঘটনাস্থলে আপনি গিয়েই বলা নেই, কওয়া নেই আপনার চাচাতো ভাইয়ের সাথে যে মারামারি লেগেছে তাকে কষে কয়েকটি থাপ্পড় দিয়ে দিলেন। এই যে আপনি জাহেলী যুগের মানুষের মতো কাজ করলেন! আপনি মারামারির কারণ জিজ্ঞেস করেছেন? না জেনে কেন মারলেন? আপনি কোনো এক দলকে সমর্থন করেন। এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আরেকজন আরেক দলকে সমর্থন করে, এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি কেন আপনার দলের সাফাই গাইতে গিয়ে ওই লোককে মারলেন। এটা কি গোত্রপ্রীতি নয়? এটা কি দলপ্রীতি নয়? জাহেলী যুগের মানুষ এমনটাই করত। দেশে কত মানুষ যে এভাবে মৃত্যুবরণ করছে! এর কারণে কত নারী যে বিধবা হচ্ছে! কত শিশু যে ইয়াতীম হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। একেক জন একেক দল করে। আপনি আপনার দলের সাফাই গাইতে গিয়ে কেন কুপিয়ে ওই লোককে হত্যা করলেন? কেন তার বাড়িঘর, দোকান পুড়িয়ে দিলেন? ফুটবল অথবা ক্রিকেট খেলছেন, খেলছেন তো খেলছেন। সহসাই আপনার দলের একজন আপনার বিপক্ষ দলের লোকের সাথে কথা কাটাকাটি লেগেছে। আপনি কিছু না শুনে অথবা না বুঝে কেন পেছন থেকে ওই ছেলেকে ধাক্কা দিলেন? মিছিলে যায়নি বিধায় কেন আটকে রেখে ওই ছেলেকে নির্যাতন করলেন? কেন তাকে রাস্তায় ফেলে রড দিয়ে পিটালেন? কিছুদিন আগে দেখলাম, এক ছেলে আর্জেন্টিনা দলকে সাপোর্ট করে, আরেক ছেলে ব্রাজিল দল সাপোর্ট করে। ঠুনকো একটি বিষয় নিয়ে দুজনের মাঝে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। এখান থেকে ঝগড়া ছড়িয়ে গেছে সারা গ্রাম জুড়ে। একজন আরেকজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করছে, কুকুরের মতো লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। এটা কি জাহেলী যুগের রীতি নয়? ছোট ভাই অন্যায় করে একজনকে মেরেছে। বড় ভাই তাকে কিছু না বলে উল্টো ওই ব্যক্তিকে বিশাল বাঁশ দিয়ে মাথায় আঘাত করেছে। বেচারার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে। বড় ভাইয়ের উচিত ছিল বিষয়টা খতিয়ে দেখে সুন্দর ও সুষ্ঠু বিচার করা। তা না করে কী করেছে আপনি তো দেখলেন। এটা না করার জন্যই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ১২।

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ‘ন্যায়বিচার করতে কারো প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার করো। এটা তাক্বওয়ার নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা করো, তার খবর রাখেন’ *(আল-মায়েদা, ৫/৮)*।

আমাদের দেশে একদল আরেক দলকে কীভাবে নির্দয়ভাবে মারে তা তো আপনি ভালো করেই জানেন। যে মারছে সেও জানে না কেন মারছে আর যে মার খাচ্ছে সেও জানে না কেন মার খাচ্ছে। যে মারছে সে নেতার কথা শুনে মারছে। এটা কি দলপ্রীতি নয়? আপনি তো জাহেলী যুগের মানুষের মতো কাজ করলেন! একবার কি ভেবেছেন? একবার কি চিন্তা করেছেন?

স্বজনপ্রীতির আরও চিত্র দেখুন- আপনি অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া করেছেন, আপনার রেজাল্ট ভালো, সবকিছু ঠিকঠাক আছে; তথাপি আপনি চাকরি পাবেন না। কারণ আপনার মামু বা খালু নেই। যার মামু বা খালু আছে, সে পেছনের বেঞ্চের ছাত্র হলেও চাকরি পাবে। আপনি শুধু সার্টিফিকেট নিয়ে দিনভর পরীক্ষাই দিবেন। চাকরি নামের সোনার হরিণ আপনার কাছে ধরা দিবে না। চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে ঠিকই। কিন্তু কে কে চাকরি পাবে তা আগে থেকেই নির্ধারিত। চাকরি পাবে অমুকের ভাগনে, অমুকের ভাতিজা, অমুকের শ্যালক, অমুকের ছেলে। আপনি যোগ্য হলেও চাকরি পাবেন না। কারণ আমরা যে স্বজনপ্রীতির রোগে আক্রান্ত! সারা দেশে একই অবস্থা! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রতিটি সেক্টরেই এই বেহাল অবস্থা। যোগ্য মানুষ চাকরি পাচ্ছে না। কারণ তার মামু বা খালু নেই আর অযোগ্যরা ঠিকই চাকরি পাচ্ছে। কারণ উপরে তার কেউ আছে। এই বিষয়টির কথাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এটাই ক্বিয়ামতের আলামত। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ‘যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে, তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। রাবী বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমানত কীভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যখন কোনো দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হবে, তখনই ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে’।[২]

জাহেলী যুগের এই স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি, দলপ্রীতি ও সংগঠনপ্রীতির রোগটি আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেছে। আপনি চাকরির জন্য যাবেন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কোন দল করেন? আপনি যদি তাদের দল না করেন অথবা তারা যেই মতাদর্শে বিশ্বাসী, আপনি সেই মতাদর্শে বিশ্বাসী না হন, তাহলে আপনার চাকরি হবে না। আপনি যত বড় যোগ্য ব্যক্তিই হোন না কেন। পক্ষান্তরে যদি তাদের দল করেন অথবা তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার চাকরি হবে।

বিচারের ক্ষেত্রে যদি আপনি যান, তাহলে স্বজনপ্রীতি যে কোন পর্যায়ে গেছে তা দেখলে আপনার চোখ চড়কগাছ হবে। বিচারকের কোনো আত্মীয় কেউ অন্যায় করলে অনেক ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু বিচার পাওয়া যায় না। এখন তো গরিবরা সুষ্ঠু বিচারই পায় না। সব জায়গায় স্বজনপ্রীতির ছড়াছড়ি। হাদীছে স্বজনপ্রীতি দূর করার জন্য বলা আছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, মাখযূমী গোত্রের এক মহিলার ব্যাপার কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল, যে চুরি করেছিল। ছাহাবীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়ভাজন উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া এটা কেউ করতে পারবে না। তখন উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তুমি আল্লাহর শাস্তির বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?’ এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিলেন এবং বললেন, ‘হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় তোমাদের আগের লোকেরা গুমরাহ হয়ে গিয়েছে। কারণ কোনো সম্মানী ব্যক্তি যখন চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোনো দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার উপর শরীআতের শাস্তি ক্বায়েম করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ-এর কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে, তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ তার হাত কেটে দিবে’।[৩]

আল্লাহ তাআলা আমাদের স্বজনপ্রীতির রোগ থেকে হেফাযত করুন- আমীন!

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯৬।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৮।

রহস্যময় মানব মস্তিষ্ক

*-মো. হারুনুর রশীদ**

মহান আল্লাহর সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হলো মানুষ। তিনি তাঁর এ সৃষ্টিকে আশরাফুল মাখলূকাত অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন।

মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের নাম মস্তিষ্ক। দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজগুলো নিপুণভাবে করে যায় এই ব্রেন বা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ। মস্তিষ্কই মানুষের শরীর ও মনের চালিকাশক্তি। একে তাই দেহের ‘হেড অফিস’ বা ‘সদর দপ্তর’ বলা হয়। প্রাণিজগতে বুদ্ধিমত্তায় সবার ওপরে মানবজাতির অবস্থান। মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা করার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি ও মেধা তাকে আগ্রহী করে তুলেছে, নিয়োজিত করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়। এর সফল প্রয়োগে হাজার বছরে মানবজাতি হয়ে উঠেছে চেনা দুনিয়ার নিয়ন্ত্রক। বুদ্ধিমত্তার শিখরে পৌঁছানো এই মানুষের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে তার শরীরের ছোট্ট একটি অঙ্গ মস্তিষ্ক। আরও অনেক প্রাণীর মস্তিষ্ক থাকা সত্ত্বেও প্রায় ১.৫ কিলোগ্রাম ওযনের এই অঙ্গটির বিশেষ গঠন ও বিস্ময়কর কার্যক্ষমতাই মানুষকে করেছে অন্যান্য প্রাণী থেকে ভিন্ন, দিয়েছে অনন্য কিছু ক্ষমতা।

মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের সমস্ত জৈবিক কাজ, শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন থেকে শুরু করে হাঁটাচলা, দেখাশোনা, কথা বলার মতো দৈনন্দিন কাজগুলো। আবার সেই একই মস্তিষ্ক থেকে প্রসূত হয় বুদ্ধিমত্তা, মেধা, আবেগ, স্মৃতিশক্তি, সৃজনশীলতা সবকিছু। একজন মানুষের জীবদ্দশায় এই কাজগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যায় মস্তিষ্কের প্রায় ৮৬ বিলিয়ন নিউরন আর তাদের মধ্যে রয়েছে ১০০ ট্রিলিয়ন সংযোগ! এরকম ট্রিলিয়ন সংখ্যক নিউরন একত্রিত হয়ে আমাদের দেহ পরিচালনা করেছে। এখানে অবশ্যই অসীম শক্তিধর একজন আছেন যিনি এই বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, যিনি সমগ্র জীব ও জীবনের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু বিনিময়ে আমরা রবকে কী দিচ্ছি? আমাদের কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নয়? আল্লাহ তাই একদিকে যেমন আমাদের চোখ-কান দিয়েছেন, তেমনিভাবে তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা, ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ ‘তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাকো’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৭৮)*।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ডিজিটাল ডাটা তৈরি হয়েছে, তার সবকিছুই একজন মানুষের একটি মস্তিষ্কেই এঁটে যাবে! এতই অকল্পনীয় এর ক্ষমতা! তাই মানব মস্তিষ্ক এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় রহস্য। কেন একে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় রহস্য বলা হয়, তারও একটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যে গ্যালাক্সিতে আমাদের সৌরজগতের অবস্থান, সেই মিল্কিওয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ১ লক্ষ আলোকবর্ষ। অর্থাৎ এক সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার গতিতে ভ্রমণ করলে এর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যেতে সময় লাগবে প্রায় ১ লক্ষ বছর। মিল্কিওয়েতে আছে কমপক্ষে ১০০ বিলিয়ন নক্ষত্র। অথচ আমাদের এই মস্তিষ্কে নিউরন আছে প্রায় ৮৬ বিলিয়ন। একটি নিউরন ও তার আশেপাশের নিউরনগুলোর মধ্যে গড়ে ১০ হাজার সংযোগ থাকে। সেই হিসেবে মস্তিষ্কে প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে যে পরিমাণ সংযোগ থাকে, তার সংখ্যা মিল্কিওয়ের নক্ষত্রের সংখ্যার চেয়েও বেশি। আর পুরো মস্তিষ্কে সংযোগ থাকে প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন। এ থেকে অনুমান করা যায়, আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা অকল্পনীয়।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৯০ সালে উৎক্ষেপণের পর থেকে গত ৩৪ বছরে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ যত উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছে, সেই পরিমাণ উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে মস্তিষ্কের সময় লাগবে ৩০ সেকেন্ডেরও কম। মস্তিষ্কের উপরিভাগে যে অংশটিকে কর্টেক্স বলে, এখানে ছোট একটি বালুকণার সমান আয়তনে তথ্য ধারণ করা সম্ভব প্রায় ২ হাজার টেরাবাইট।

গত ১০০ বছরে মস্তিষ্ক গবেষণায় অভাবনীয় অগ্রগতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মোটামুটি ধারণা থাকলেও, অনেক কিছুই এখনও অজানা। মস্তিষ্ক নিয়ে আমাদের জানার পরিধি যত বাড়ছে, আরও নতুন নতুন রহস্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে।

মস্তিষ্ক খুলির ভিতর অবস্থিত। খুলি কতকগুলো শক্ত হাড় দ্বারা তৈরি। মস্তিষ্কের বাহিরে তিন স্তরবিশিষ্ট পর্দা থাকে, যাকে বলা হয় মেনিনজিস। মস্তিষ্কের ওযন প্রায় ১.৫ কিলোগ্রাম। আমাদের খুলির ভেতর CSF (Cerebrospinal Fluid) নামক এক ধরনের তরল পদার্থ থাকে। ব্রেন এই তরল পদার্থের মধ্যে ভেসে থাকে বলে মস্তিষ্কের ওযন মনে হয় মাত্র ৫০ গ্রাম। এই জন্য মাথা ভার মনে হয় না। মস্তিষ্কের কোষকে বলা হয় নিউরন। মস্তিষ্কে রয়েছে প্রায় ৮৬ বিলিয়ন নিউরন। প্রতিটি নিউরন কমপক্ষে ১০ হাজার নিউরনের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। আমরা মস্তিষ্ককে যদি সুবিশাল আকাশের সাথে কল্পনা করি, তবে নিউরনগুলো হচ্ছে একেকটা নক্ষত্র।

আমাদের মস্তিষ্কের প্রধান অংশের নাম Cerebrum, ডান Cerebrum এবং বাম Cerebrum। শরীরের ডান অংশ

* ফরক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর।

নিয়ন্ত্রণ করে বাম Cerebrum এবং বাম অংশ নিয়ন্ত্রণ করে ডান Cerebrum। Cerebrum-এর চারটি অংশ আছে। সেগুলো হলো— Frontal lobe, Parietal lobe, Occipital lobe এবং Temporal lobe.

Cerebrum-এর সামনের অংশের নাম Frontal lobe। এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হাঁটাচলা, কাজকর্ম, কথা বলা, নির্বাহী কাজকর্ম, বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। Parietal lobe নিয়ন্ত্রণ করে শরীরে অনুভূতি। যেমন কোনো জায়গা কেটে গেলে আমরা ব্যথা পাই। তারপর চোখ বুজেও কোনো কিছু ধরলে আমরা বুঝতে পারি জিনিসটা কী? এই সব নিয়ন্ত্রণ করে Parietal lobe.

Temporal lobe আমাদের শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ এবং শব্দ কান দিয়ে শুনতে সাহায্য করে।

Occipital Lobe নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের মহামূল্যবান জিনিস এই সুন্দর পৃথিবী চোখ দিয়ে দেখা।

একটা জিনিস লক্ষণীয়, যেমন- আমি যদি হাঁটতে না চাই, তাহলে বসে থাকতে পারি আবার হাঁটতে চাইলে হাঁটতেও পারি। এটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এটার নাম Voluntary Action। আবার কিছু অঙ্গ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যেমন- হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ড নিজেই পাম্প করতে থাকে। এটা মিনিটে ৭২ বার পাম্প করতে থাকে। হৃৎপিণ্ড আমি বললেই বন্ধ হবে না। এটাকে বলা হয় Autonomic action।

Cerebrum মানুষের Voluntary action নিয়ন্ত্রণ করে। Autonomic action নিয়ন্ত্রণ করে Hypothalamus ও brainstem। Hypothalamus থাকে Cerebrum-এর মধ্যে ও Brainstem থাকে Cerebrum-এর নিচে ও Cerebellum এর সামনে।

Brain-এর পিছনের অংশটুকুকে বলা হয় Cerebellum. Cerebellum-এর কাজ হচ্ছে শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা। আমরা যে হাঁটাচলা করি তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Cerebellum গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি Cerebellum-এ কোনো রোগ হয়, তাহলে মানুষ হাঁটতে পারবে না এবং একদিকে পড়ে যাবে। এমনকি বসা থেকে উঠতেই পারবে না। Medulla Oblongata থেকে রশির মতো একটি অঙ্গ কোমর পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। চিকিৎসা বিদ্যায় এটাকে Spinal Cord বলা হয়। Mid Brain, Pons ও Medulla Oblongata-কে একত্রে Brainstem বলে।

Cerebrum-এর ভিতরে আরেকটি অংশ আছে, যার নাম Lymbic System। এই System মানুষের আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসা, রাগ, ক্রোধ, হিংসা, ভালোলাগা বা ভালো না লাগা নিয়ন্ত্রণ করে। Lymbic System-এর যদি কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, তাহলে মানুষের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। যাকে চিকিৎসা বিদ্যায় বলা হয় Schizophrenia। আমাদের প্রচলিত ভাষায় বলা হয় পাগল।

নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitter) হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক তরল জাতীয় পদার্থ। Brain-এর মধ্যে অনেক ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার আছে, যেমন- এসিটাইলকলিন, এড্রেনালিন, ডোপামিন ইত্যাদি। এসব রাসায়নিক পদার্থ Brain-এর স্বাভাবিক কাজকর্মে সহায়তা করে থাকে। এসব রাসায়নিক পদার্থ বেশি কাজকর্ম (Overactive) করে থাকলে যেমন অনেক রোগের সৃষ্টি করে, তেমনই কম কাজকর্ম (Underactive) করলে অনেক রোগের সৃষ্টি করে। যেমন Brain-এর ডোপামিন কমে গেলে Perkinsonism রোগের সৃষ্টি করে, যার লক্ষণ হচ্ছে হাত-পা কাঁপানো, হাত পা শক্ত হয়ে যাওয়া এবং হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হওয়া। আবার Dopamine-এর Overactive হলে Schizophrenia রোগ সৃষ্টি হয়, আমরা যাকে মানসিক ভারসাম্যহীনতা বলে থাকি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ঐ সব রোগে CT Scan করলে কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে না। কারণ এসব রোগে Brain-এর গঠনগত কোনো সমস্যা হয় না, শুধু Functional সমস্যা হয়।

হরমোন হচ্ছে এক ধরনের তরল পদার্থ, যা আমাদের শরীরে বিভিন্ন জৈবিক কাজ সাধন করে। হরমোন যেখান থেকে নিঃসরণ হয়, তাকে বলা হয় গ্লান্ড। আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো গ্লান্ড আছে এবং প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ আছে। যেমন গলায় থাকে থাইরয়েড গ্লান্ড। থাইরয়েড থেকে নিঃসরণ হয় থাইরক্সিন, যা আমাদের শরীরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক কাজ সম্পন্ন করে। কিডনির ওপরে একটা গ্লান্ড থাকে যার নাম Suprarenal Gland। এখান থেকে যেসব হরমোন নিঃসরণ হয়, তা আমাদের শরীরের লবণ ও পানি নিয়ন্ত্রণ করে। ছেলেদের Testis এবং মেয়েদের Overy থেকে কিছু হরমোন নিঃসরণ হয়, যা ছেলেমেয়েদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গঠন করতে সাহায্য করে। এছাড়া আরও কিছু গ্লান্ড আছে, যা প্রত্যেকেই আপন আপন কাজ করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসব গ্লান্ড থেকে যেসব হরমোন নিঃসরণ হয়, সেগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে Pituitary gland অথবা Master gland। এই Pituitary gland, Barin-এর মধ্যে অবস্থিত।

আমাদের মস্তিষ্ককে ইংরেজিতে বলা হয় Brain। Brain-এর প্রতিটি কোষকে বলা হয় Neuron। Brain-এর নিচ থেকে আমাদের পেছনে মেরুদণ্ডের মাঝে দড়ির মতো একটি জিনিস বের হয়ে কোমরে গিয়ে শেষ হয়েছে। তাকে বলা হয় Spinal Cord। Spinal Cord থেকে জালের মতো সমস্ত

শরীরে Neuron গুলো ছড়িয়ে পড়েছে। Brain, Spinal Cord ও শরীরের সমস্ত Neuron-গুলোকে একসাথে বলা হয় স্নায়ুতন্ত্র। ইংরেজিতে বলা হয় Nervous System। Nervous System সম্পর্কে জানা, গবেষণা করা এবং লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করাই হচ্ছে নিউরোলজি (Neurology)।

মন ও ব্রেন নিয়ে পৃথিবীতে অনেক গবেষণা হয়েছে। ডা. গোল্ড ফেটইন, ড. জন মোটিল, ডা. পেনফিল্ড ও ড. জন দীর্ঘ গবেষণা করে দেখেছেন, একজন প্রোগ্রামার যেভাবে কম্পিউটার পরিচালনা করে, মনও ঠিক সেভাবে ব্রেনকে পরিচালিত করে। বুকের মধ্যে হৃদয় আছে সেটি Heart নামে পরিচিত। কিন্তু মন আমাদের Brain-এ অবস্থিত, বুকের মধ্যে নয়। Heart নিয়ন্ত্রণ করে এই Brain। সংক্ষেপে বলতে গেলে মানুষের প্রতিটি অঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে Brain।

একজন মানুষ খুব জ্ঞানী, কম কথা বলে, ভাবুক আর একজন তত জ্ঞানীও নয়, বেশি ভাবে না— এই দুইজনের মধ্যে যে পার্থক্য এটিও Brain-এর গঠনতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। Brain যদি খালি চোখে দেখি, তাহলে দেখব অনেকগুলো গর্তের মতো এবং অনেকগুলো উঁচু টিলার মতো। গর্তের মতো অংশগুলোকে চিকিৎসা বিদ্যায় বলা হয় Sulcus এবং উঁচু টিলার মতো অংশকে বলা হয় Gyrus। গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার যে তারতম্য তা অনেকখানি নির্ভর করে এই Sulcus ও Gyrus-এর গঠনতন্ত্রের উপর।

Brain-কে বাঁচিয়ে রাখতে অনবরত রক্তপ্রবাহ থাকতে হবে। Brain-এ রক্তপ্রবাহ সচল করার জন্য তিনটি Artery (ধমনি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনটি Artery হচ্ছে— Anterior Cerebral Artery, Middle Cerebral Artery ও Pesterior Cerebral Artery। এসব Artery হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়। উপর্যুক্ত Artery গুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম Artery-তে বিভক্ত হয়ে আমাদের Brain-এ রক্ত প্রবাহিত করে। কোনো কারণে রক্তনালিতে Block বা বাধা হলে অথবা রক্তনালি ছিঁড়ে গেলেই মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহে সমস্যা সৃষ্টি হয়, একে চিকিৎসা বিদ্যায় বলা হয় Stroke। আমাদের মস্তিষ্কে স্বাভাবিক রক্তের প্রয়োজন হয় 50ml/100g/min. অর্থাৎ 100g Brain-এ প্রতি মিনিটে 50ml রক্তপ্রবাহ প্রয়োজন। যদি কোনো কারণে রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে এবং রক্তপ্রবাহ (18ml/100g/min.)-এর নিচে চলে যায়, তাহলে Brain-এর কোষগুলো কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; কিন্তু আবার রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক হলে নিউরন কর্মক্ষমতা ফিরে পায়। কোনো কারণে যদি রক্তপ্রবাহ (8ml/100g/min.)-এর নিচে চলে যায়, তাহলে নিউরনগুলো মরে যায় এবং আর কখনো জীবিত হয় না।

আমাদের মস্তিষ্ক মিরাকলে পরিপূর্ণ। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ইনফরমেশন আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে বিভিন্ন অনুভূতিসম্পন্ন অঙ্গের মাধ্যমে। অনুভূতিসম্পন্ন অঙ্গগুলো হচ্ছে চোখ, কান, চর্ম, নাক ও জিহ্বা। কিন্তু মস্তিষ্ক প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন নিয়ে কাজ করে এবং বাকিগুলো নিয়ে কাজ করে না। এটা আমাদের মস্তিষ্কের অন্যতম বিস্ময়কর দিক। আমাদের Brain Stem-এ কতকগুলো জালের মতো নিউরন থাকে, তাকে চিকিৎসা বিদ্যায় Reticular formation বলা হয়। এই Reticular formation ট্রাফিক কন্ট্রোল এর কাজ করে। ১০০ মিলিয়ন ইনফরমেশন থেকে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন বাছাই করে এবং Cerebrain-এ পাঠায় আর মস্তিষ্ক সেই অনুযায়ী কাজ করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা যে খাদ্য খাই এবং তাতে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তার ২০% শক্তি মস্তিষ্ক ব্যবহার করে। মস্তিষ্ক প্রতিদিন প্রায় ২০ ওয়াটের সমান বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। এতদিন বিজ্ঞানীরা ধারণা করত, মানুষ জন্মের সময় মস্তিষ্কে যত সংখ্যক নিউরন থাকে তারপর আর নিউরন তৈরি হয় না। শুধু বিভিন্ন কারণে নিউরন মারা যায়। কিন্তু সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে, মস্তিষ্কে সারাজীবনই নতুন নিউরন যোগ হয়, যার সংখ্যা মাসে হাজার থেকে লক্ষাধিক হতে পারে। নিউরন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়, পুষ্টিকর খাদ্য ও ব্যায়ামের মাধ্যমে। বয়সের সাথে সাথে আমাদের মস্তিষ্কের আকার ছোট হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, নিউরনের সংখ্যা কমে না, শুধু নিউরনের আকার ছোট হয়। একজন মানুষের ৮০ বছরে মস্তিষ্কের ওযন ১০% হ্রাস পায়। চিকিৎসা বিদ্যায় এটাকে Senile Atrophy বলা হয়। এর ফলে মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগে থাকেন। ভুলে যাওয়া (Forgetfulness) তার মধ্যে সবচেয়ে কমন সমস্যা।

গবেষণায় দেখা গেছে, পুষ্টিকর খাদ্য, ব্যায়াম, ধূমপান না করা, মদ্যপান না করা এবং সবসময় হাসিখুশি থাকলে Senile Atrophy অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব। মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যপরিধি বড় রহস্যময়। আইনস্টাইন ফোন নম্বর ও বন্ধুদের নাম মনে রাখতে পারত না। কিন্তু সে পরমাণু বোমা আবিষ্কার করে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ লেখাপড়া করে সেই রকম কোনো সনদ অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু দুজনই বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত প্রতিভা। তাদের জীবনী নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি হচ্ছে। ব্রেন অতি চমৎকার একটি অঙ্গ। এ বিষয়ে গবেষণা চলছে এবং অনন্তকাল গবেষণা চলবে।

তথ্যসূত্র:

১. আল-কুরআনুল কারীম।
২. হাসান তারেক চৌধুরী, মস্তিষ্ক।
৩. ডা. মো. আনোয়ার হোসেন বাবলু, স্ট্রোক ও মাথা ব্যথার সাতকাহন।

আদ-দাওয়া ইলাল্লহ: এসো! আল্লাহর পথে...

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-২)

আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে সকলেই মেনে নেয়: সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক নাস্তিক ছাড়া অধিকাংশ মানুষই এক সৃষ্টিকর্তাকে প্রতিপালক (রব) হিসেবে স্বীকার করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ - اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

‘আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, ‘কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ ও সূর্যকে নিয়োজিত করেছেন?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। তাহলে কোথায় তাদের ফিরানো হচ্ছে? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা করেন, রিযিক্ব প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা, সীমিত করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, ‘কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন?’ তবে তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। বলুন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর’। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৬১-৬৩)*।

শুধু ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানরাই নয়, বরং তৎকালীন জাহেলী যুগের মুশরিকরাও মহান আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করত। এমনকি আবূ জাহল ও আবূ লাহাবও। যেমন- বদরের দিনে আবূ জাহল আল্লাহর কাছে দু‘আ করে বলেছিল, اللَّهُمَّ أَيُّنَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ وَأَرْضَى لَكَ، فَانْصُرْهُ الْغَدَ ‘হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে তোমার নিকট প্রিয় এবং তোমার সন্তোষভাজন, আগামীকাল তাকেই বিজয় দান করো’।

এমনকি বদরের দিন মক্কার মুশরিকরাও আল্লাহর কাছে এভাবে দু‘আ করেছিল, قالوا يعني المشركين في بدر: اللَّهُمَّ أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا نعرف، فأحنه الغداة (أي: أَهلكه اليوم) ‘তারা বলেছিল, অর্থাৎ বদরের মুশরিকরা বলেছিল, ‘হে আল্লাহ! (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং আমাদের এমন কিছু নিয়ে এসেছেন যা আমরা চিনতাম না। সুতরাং আজকের দিনে আপনি তাঁকে ধ্বংস করে দিন’।[১]

আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র হক্বদার কে?

কে সেই মহাশক্তিধর সত্তা, যিনি এই পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিজীবের প্রশ্নাতীত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের একমাত্র যোগ্য? অবশ্যই তিনি, যিনি এই মহাবিশ্বের প্রকৃত স্রষ্টা, প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক। তিনিই সেই সর্বশক্তিমান সত্তা, যাঁর নিকট আমরা চাই বা না চাই, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—অবশেষে ফিরে যেতে বাধ্য।

আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমাদের চারপাশের প্রকৃতি—সবই তাঁর সৃষ্টি এবং একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন। আমরা তাঁর নির্ধারিত নিয়মের উপর নির্ভর করেই জীবনযাপন করি।

সুতরাং আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ভক্তি ও প্রশ্নাতীত আনুগত্য একমাত্র তাঁর জন্যই হওয়া উচিত। আর এটিই সবচেয়ে যৌক্তিক ও ন্যায্য।

দুঃখজনক হলেও সত্য, অধিকাংশ মানুষ যদিও এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তাঁকে এককভাবে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূর্ণ আনুগত্য প্রদান করে না।

প্রতি যুগে শয়তান মানুষের মনে ভয় সৃষ্টি করে তাদের আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। শয়তানের অন্যতম দুটি পদ্ধতি হলো—

প্রথমত, মানুষের মনে এই ভয় ঢোকানো—‘তুমি অনেক বড় গুনাহগার। আল্লাহ কখনোই তোমাকে ক্ষমা করবেন না’।

দ্বিতীয়ত, এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা—‘তুমি আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। আল্লাহর কাছে পৌঁছতে হলে তোমার বিশেষ প্রতিনিধির প্রয়োজন, যাদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব’।

ফলে মানুষদের একাংশ যিশু খ্রিষ্ট ও তার মা মারইয়ামকে, কেউ মা দুর্গা বা কালীকে, আবার কেউ বিভিন্ন পীর-আউলিয়া ও কবরবাসীদের আল্লাহর প্রতিনিধি বা সুপারিশকারী মনে করে তাদের ইবাদsত ও আনুগত্য শুরু করে। তারা তাদের সামনে মাথা নত করে, মানত করে, নজরানা পেশ করে এবং ইচ্ছাপূরণের আশায় তাদের প্রতি ভক্তি নিবেদন করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলে,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

‘আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, ‘এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী’। বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন?’ তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে’ *(ইউনুস, ১০/১৮)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. ইবন হিশাম, আস-সীরাতু আন-নাবাবিয়্যাহ, ১/৬২৪।

‘আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারা বলে, ‘আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে’। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে, আল্লাহ নিশ্চয় সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফের, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হেদায়াত দেন না’ *(আয-যুমার, ৩৯/৩)*।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝা যায়— মক্কার মুশরিকরা তাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমতুল্য মনে করত না। বরং তারা বিশ্বাস করত—আল্লাহই সর্বশক্তিমান রব। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পেতে হলে এই মূর্তিগুলোর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে—এই ছিল তাদের ভুল বিশ্বাস।

সুতরাং শিরক শুধু এটুকুই নয় যে, কেউ আল্লাহকে অস্বীকার করল বা অন্য কাউকে ইলাহ বা রব বলে মানল। বরং সবচেয়ে ভয়াবহ শিরক হলো—আল্লাহকে বিশ্বাস করেও তাঁর সাথে অন্য কাউকে সুপারিশকারী মনে করে ইবাদত করা, যেমন করত মক্কার মুশরিকরা।

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই যুগে যুগে বহু মানুষকে তাওহীদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। সুতরাং একমাত্র উপাস্য, একমাত্র রব এবং একমাত্র আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ তাআলা—আর এটাই চিরন্তন সত্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ ‘তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদতে) শিরক করা অবস্থায়’ *(ইউসুফ, ১২/১০৬)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ‘যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত’ *(আল-আনআম, ৬/৮২)*।

আমাদের পরিপূর্ণ আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র যোগ্য হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করে যাচ্ছেন। তিনি ব্যতীত আর কারও প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য প্রদর্শন করা অত্যন্ত মারাত্মক অন্যায়। এটি এক ভয়াবহ গুনাহ, যা মানুষকে শিরকের গভীর অন্ধকারে নিপতিত করে।

নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে এই ভুল ধারণা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তারা মানুষকে বোঝাতেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেকের কথা শুনতে পান, সকলকে দেখতে পান এবং কারও হৃদয়ের গভীরতম চিন্তাও তারা বুঝেন। সুতরাং তাঁর কাছে কিছু চাইতে কোনো মাধ্যম, কোনো বাহক কিংবা কোনো তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন নেই। বরং যেহেতু তিনিই সবকিছু জানেন, দেখেন এবং শোনেন, তাই আমাদের চাওয়ার জন্য সরাসরি তাঁর কাছেই ফিরে যাওয়া উচিত।

এ প্রসঙ্গে একটি বাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করা যায়— ধরুন, যদি আমাদের সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলার সুযোগ হয়, তাহলে আমরা কি তার সাথে কথা বলার জন্য কোনো দালাল খুঁজব? কোনো মাধ্যমের দ্বারস্থ হব? নিশ্চয়ই না। আমরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথেই কথা বলব। একইভাবে, যখন আমাদের মহান প্রভুর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ রয়েছে, তখন তার বদলে অন্য কারও শরণাপন্ন হওয়া এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।

নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) মানুষের সামনে এই সরল সত্যটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন—আল্লাহ চাইলে সবরকম গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন, আল্লাহর দরবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাঁর করুণার দরজা সর্বদা খোলা, আর তাঁর ক্ষমাশীলতা অতুলনীয়। সুতরাং গুনাহের ভয়াবহতায় ভীত হয়ে মানুষের তৈরি মূর্তি, পীর, ওলীর কাছে কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা চরম পর্যায়ের দাসত্ব ও বোকামি।

মানুষের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করার জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বারবার মিথ্যা উপাস্যদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে প্রতিপালকত্বের পরীক্ষায় ডেকেছেন। কেননা, একজন প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার প্রধান শর্ত হলো, তাঁর সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকতে হবে। অথচ, এই মিথ্যা ইলাহদের কোনো সৃষ্টি করার ক্ষমতাই নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআনে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন—এরা যদি সত্যিই উপাস্য হতো, তবে একটি মাছিও সৃষ্টি করে দেখাক! অথচ তারা একটি মাছি তো দূরে থাক, একটি পাতাও সৃষ্টি করতে পারে না।

এই যুক্তির সারমর্ম হলো— যে সৃষ্টিকর্তা নয়, সে উপাস্য বা ইবাদতের যোগ্য নয়। যে জীবন-মৃত্যুর মালিক নয়, তার আনুগত্য করা যায় না। যে নিজেই খাবার, ঘুম, পেশাব-পায়খানা, স্ত্রী, পুত্র, পিতা-মাতার মুখাপেক্ষী—সে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আত্মসমর্পণের অযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং সমস্ত দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যিনি সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী, মালিক ও একচ্ছত্র প্রতিপালক—তিনিই একমাত্র প্রশ্নাতীত আনুগত্য পাওয়ার উপযুক্ত।

নিম্নে কুরআনুল কারীম থেকে এই সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আয়াত পেশ করা হলো—

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফলফলাদি তোমাদের জন্য রিযিক্বস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনেবুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না’ *(আল-বাক্বারা, ২/২১-২২)*। আল্লাহ বলেন,

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ - إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ - يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ - إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ - وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾

‘তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান আর তিনিই সূর্য ও চাঁদকে বশীভূত করে দিয়েছেন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করছে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই। আর আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো, তারা খেজুরের আঁটির আবরণেরও মালিক নয়। যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের ডাক শুনবে না; আর শুনতে পেলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং ক্বিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শরীক করাকে অস্বীকার করবে। আর সর্বজ্ঞ আল্লাহর ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করবে না। হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত। যদি তিনি চান তোমাদেরকে সরিয়ে দেবেন এবং একটি নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসবেন। আর তা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়’ *(ফাত্বির, ৩৫/১৩-১৭)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ - وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ ‘তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে, যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়? আর তারা তাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৯১-১৯২)*। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾

‘বলুন, ‘তোমরা আমাকে সংবাদ দাও- তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, আমাকে দেখাও তো তারা যমীনে কী সৃষ্টি করেছে? অথবা আসমানসমূহে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি? এর পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের আহ্বান সম্পর্কে উদাসীন’ *(আল-আহক্বাফ, ৪৬/৪-৫)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ‘আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(ইউনুস, ১০/১০৬)*। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ - إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ - وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾

‘আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর। আর যদি যালেমগণ দেখে— যখন তারা আযাব দেখবে যে, নিশ্চয় সকল শক্তি আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ আযাব দানে কঠোর। যখন যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছে, তারা অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং তারা আযাব দেখতে পাবে। আর তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যারা অনুসরণ করেছে, তারা বলবে, ‘যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো, তাহলে আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছে’। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ। আর তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৬৫-১৬৬)*। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا - أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾

‘বলুন, ‘তাদেরকে ডাকো, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে (উপাস্য) মনে কর। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না’। তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের আযাব ভীতিকর’ *(আল-ইসরা, ১৭/৫৬-৫৭)*।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

কঠিন বিপদে রাসূল ﷺ যা করতেন

*-হাসান আল-বান্না মাদানী**

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য আর এই জগতকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের উপকারের জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পৃথিবীতে আমাদের পরীক্ষা নিতে থাকেন। কখনো দুঃখ-বেদনা, আবার কখনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ 'আমরা মন্দ ও ভালো দ্বারা তোমাদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩৫)*।

আনন্দকালীন ইবাদতে তৎপর হলেও আমাদের অনেকেই বিপদকালীন ইবাদত হতে উদাসীন। অনেকে সুস্থতা ও সচ্ছলতায় যদিও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তাঁর ইবাদত করে, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের সময় তাঁকে ভুলে গিয়ে ইবলীসের অনুসরণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾

'আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে, তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্ব চেহারায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখেরাতে, এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি' *(আল-হজ্জ, ২২/১১)*।

মুসলিমরা কি বিপদকালে দ্বীন ত্যাগ করা মুরতাদদের অনুসরণ করবে?

ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষের জীবনে বিপদ যেকোনো সময় সহসায় আসতে পারে এবং বিপদ কখনো খুব বড়ও হতে পারে। যখন বড় কোনো বিপদ এসে পড়ে, তখন মানুষকে বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়। সাধারণত মানুষ আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায় এবং শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে স্বস্তির সন্ধানে গুনাহের পথে হাঁটতে শুরু করে। ভীষণ সংকটে মানুষ যদি আল্লাহ তাআলাকে না ভুলে যায়, নবী ﷺ-এর পদ্ধতি অনুযায়ী এই বিপদের হতাশাময় সময়টাকে অতিবাহিত করার চেষ্টা করে, তাহলে সে পৃথিবীতে সেই বিপদ থেকে বেঁচে যাবে এবং আখেরাতে সফলকাম হবে।[১]

বিপদের সময় রাসূল ﷺ আমাদেরকে কী শিক্ষা দিয়েছেন?

১. আল্লাহ তাআলার কাছে নিরাপত্তা চাওয়া: রাসূল ﷺ ছাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিতেন যে, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে নিরাপত্তা চাও'।[২] আর তিনি নিজেও সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআলার কাছে নিরাপত্তা কামনা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي 'রাসূল ﷺ সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আগুলো ছাড়তেন না'। দু'আ—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي.

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করুন। নিরাপত্তা দান করুন আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের মধ্যে'।[৩]

২. আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া: রাসূল ﷺ যখন কোনো মহাবিপদের সম্মুখীন হতেন, তখন একমাত্র আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি নির্ভরশীল হতেন। নবী ﷺ মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করছেন, সাথে আছেন আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু। মক্কার কুরাইশরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। শত্রুদের চোখ এড়িয়ে নবী ﷺ ও আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু আশ্রয় নেন 'ছাওর' নামক এক গুহায়। কিন্তু শত্রুবাহিনী ঠিক গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু শঙ্কিত হয়ে পড়েন। রাসূল ﷺ-কে বলেন, لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا 'হে রাসূল ﷺ! কাফেররা আমাদের এত কাছে চলে এসেছে যে, তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তাহলেই আমাদেরকে দেখতে পাবে'।

রাসূল ﷺ আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার এক বড় উদাহরণ পেশ করলেন। আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন, مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا؟ 'হে আবূ বকর! এমন দুইজনের বিষয়ে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ তাআলা?'[৪]

ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তো সবার সঙ্গে আছেন, তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে। কিন্তু এখানে তাদের দুজনের সাথে আল্লাহ তাআলা আছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তাআলা তাদের সহযোগিতা করবেন'।[৫]

বিপদের সময় যেমন আল্লাহ তাআলার প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে, তেমনি এই পৃথিবী আল্লাহ তাআলা পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন- এই বিশ্বাস রেখেই ধৈর্যধারণ করতে হবে।

রাসূল ﷺ-এর জীবনে বিপদ:

রাসূল ﷺ-এর উপর যত বড় বড় বিপদ এসেছে, তার কিছুই

* কালিয়াচক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত; মুহাদ্দিছ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. মাদারিজুস সালিকীন, ১/৩৯৯।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৭২৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৪২।

৩. আবূ দাঊদ, হা/৫০৭৪।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৫৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৮১।

৫. ফাতহুল বারী, ৭/১১।

এখনো আমাদের উপর আসেনি। রাসূল ﷺ-এর জীবনে এমন একটা বছর গেছে, যার নামই 'আমুল হুযন' (عام الحزن) বা 'দুঃখের বছর'।

চাচা আবূ তালেব রাসূল ﷺ-এর জন্য ছিলেন এক দুর্গের মতো। যতদিন আবূ তালেব জীবিত ছিলেন, রাসূল ﷺ-এর প্রতি আক্রমণের কারও সাহস ছিল না। আবূ তালেব যখন মারা যান, তার দুই-তিন মাস পরেই রাসূল ﷺ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা ইন্তেকাল করেন, যিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে দীর্ঘ ২৫ বছর জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা রাসূল ﷺ-এর জন্য ছিলেন বড় এক নেয়ামত, যিনি দুঃখ ও উদ্বেগের সময়ে রাসূল ﷺ-কে সাহস ও সান্ত্বনা দিতেন। নিজের সম্পদ দিয়েও রাসূল ﷺ-কে সহযোগিতা করতেন। একই বছরে পরপর প্রিয় দুজন মানুষ মারা যাওয়ার পরেও রাসূল ﷺ ধৈর্যধারণ করেছেন।[৬]

আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর ছেলে ইবরাহীমকে দেখতে গেলাম, যখন সেখানে পৌঁছলাম ইবরাহীম রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। নিজের সন্তানের এই অবস্থা দেখে রাসূল ﷺ-এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

সে সময় আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লা-হু আনহু মনে করলেন যে, এরূপ কান্না করা হয়তো ধৈর্যের পরিপন্থী। তাই তিনি রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি ধৈর্যের কথা বলেন আর আপনিই এভাবে কাঁদছেন! রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ 'হে ইবনু আউফ! এটি আমার মধ্যে দয়া থাকার প্রমাণ'। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ 'চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে, হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। তবুও আমরা এমন কোনো কথা বলব না, যা মহান স্রষ্টা পছন্দ করেন না। ইবরাহীম তুমি আমাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছ, তাই আমরা ব্যথাপ্রাপ্ত'।

নবী ﷺ এমন কোনো কথা বলতেন না, যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসন্তুষ্ট হন। দুঃখের সময় সাধারণত মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রতি কুধারণা করে বসে এবং নিরাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু নবী ﷺ এত বড় বড় আঘাত পেয়েও না আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কখনো বিরূপ মন্তব্য করেছেন আর না তাঁর কোনো সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যেহেতু বিপদ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দূরীভূত করতে পারেন, তাই যত কঠিন বিপদ হবে, তত বেশি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা উচিত। কারণ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই আমাদের সে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৩০৩।

বিপদের সময় দু'আ:

(১) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: **لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ**، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. 'ইউনুস আলাইহিস সালাম যখন মাছের পেটে ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহকে ডেকে বলেছিলেন, لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই। আপনি পবিত্র আর আমি যুলমকারীদের মধ্যে ছিলাম'। নবী ﷺ বললেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিপদের সময় এ দু'আ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার দু'আ কবুল করবেন'।[৭]

(২) আবূ বাকরা নুফাই ইবনু হারেছ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দু'আ হচ্ছে- دعوة المكروب: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وأَصْلِحْ لِي شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার দয়ার প্রত্যাশী, তাই আপনি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও একা অসহায় ছেড়ে দিবেন না এবং আমার সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দিন। আপনি ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই'।[৮]

(৩) উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: {**إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**} **اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا**، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا 'কোনো বান্দা বিপদের সময় যদি বলে, {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا আমরা সবাই আল্লাহরই এবং আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! এই বিপদে আপনি আমাকে নেকী দান করুন এবং এর থেকে উৎকৃষ্ট কিছু আমাকে দান করুন'। নবী ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সেই বিপদে তাকে নেকী দান করবেন এবং তার থেকে উত্তম প্রতিদান তাকে দান করবেন'।

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, যখন আমার স্বামী আবূ সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু মারা গেলেন, তখন আমি সেভাবেই দু'আ করলাম, যেভাবে রাসূল ﷺ আমাকে শিখিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার স্বামীর চেয়েও উত্তম অর্থাৎ রাসূল ﷺ-কে দান করলেন।[৯]

(৪) আসমা বিনতু উমাইস রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে কিছু শব্দ শিখিয়েছেন, যেটি আমি বিপদের সময় বলব আর তা হলো, اللهُ اللهُ رَبِّيْ، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا 'আল্লাহ আল্লাহ আমার

৭. তিরমিযী, হা/৩৫০৫।
৮. আবূ দাঊদ, হা/৫০৯০।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৯১৮।

রব, তাঁর সাথে আমি কাউকে অংশীদার বানাই না'।[১০]

(৫) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেও এরূপ দু'আ করতেন, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতেন এবং তাঁর একত্ব প্রকাশ করতেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, كان إذا حزبه شيء قال: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ. 'রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর যখন কোনো বড় বিপদ এসে যেত, তখন তিনি এই দু'আটি পাঠ করতেন, يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ 'হে চিরঞ্জীব! হে সর্বসত্তার ধারক! আপনার রহমত দ্বারা আমি আপনার কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা চাই'।[১১]

(৬) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কঠিন বিপদের সময় এই দু'আ পড়তেন,[১২]

لَا إِلَهِ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيْمِ.

এই দু'আয় আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ও একত্ব প্রকাশ করা হয়েছে।

বিপদে ধৈর্য ও ছালাত:

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিপদের সময় ছালাতের দিকে ছুটে যেতেন। কিন্তু কত মানুষ বিপদে পড়লে আল্লাহর আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে শয়তানের শরণাপন্ন হয়। বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের একটি কঠিন অধ্যায়। মুসলিমদের অস্তিত্ব নিয়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন উৎকণ্ঠায়। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا مِنَّا رجل إِلاَّ نَائِمٌ إِلاَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ 'সবাই ছিল ঘুমন্ত। কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি গাছের সামনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছিলেন এবং দু'আ করতে থাকলেন সকাল পর্যন্ত'।[১৩]

বিপদের সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাতের দিকে অগ্রসর হতেন। কারণ আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৩)*।

বিপদাপদে এই দুটিই শক্তি প্রাপ্তির কারণ। ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বিপদকালে অবিচল থাকতে যা সর্বাধিক সহায়তা করে, তা হলো ছবর ও ছালাত।[১৪]

বিপদ থেকে বাঁচার উপায়:

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ... 'কোনো এক রাত্রে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, 'সুবহানাল্লাহ! আজকে কত প্রকার ফেতনা নাযিল হয়েছে এবং আজকে কত সম্পদের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে! বাড়ির মহিলাদেরকে জাগাও...'।[১৫]

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, অনিষ্টের আশঙ্কায় ছালাতের দিকে অগ্রসর হওয়া মুস্তাহাব।[১৬]

কারণ ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে বহু ফেতনা ছড়াবে, ধনসম্পদের প্রাচুর্য সীমা ছাড়িয়ে যাবে। তাই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় শিখালেন। শুধু ইহকালের নয়, বরং পরকালের কষ্ট থেকেও বাঁচার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

'যে লোক কোনো ঈমানদারের দুনিয়ার কোনো কষ্ট দূর করে দিবে, আল্লাহ তাআলা ক্বিয়ামতের দিন তার কোনো কষ্ট দূর করে দিবেন। যে লোক কোনো দুস্থকে সহায়তা করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে সাহায্য করবেন, বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ ততক্ষণ তাকে সহযোগিতা করতে থাকেন'।[১৭]

আমরা বুঝতে পারলাম যে, যদি কেউ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, তাহলে সে অবশ্যই রক্ষা পাবে ইনশা-আল্লাহ! আর যদি বিপদ এসেই পড়ে, তাহলে তাকে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে হবে এবং আল্লাহকেই স্মরণ করতে হবে। কেবল তাঁরই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে, ধৈর্যধারণ করতে হবে, ছালাত আদায় করতে হবে এবং সবসময় অপর মুমিন ভাইদের সহযোগিতা করতে হবে। মুমিনদের সাথে সরল ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে তার সকল পথ সহজ করে দেন। বিপদের সময় মানুষ কত ধরনের বিভ্রান্তিতে পড়ে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হে মহান স্রষ্টা! আমাদের সকলকে বড় বিপদ থেকে রক্ষা করুন। কারণ আমরা জানি না বড় বিপদের সময় আমাদের অবস্থান কী হবে, কিন্তু বিপদ এসে পড়লে আমাদেরকে ধৈর্যধারণের তাওফীক্ব দান করুন। আমাদের সকলকে কঠিন বিপদের সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের উপর অবিচল থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১০. ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৮২।
১১. তিরমিযী, হা/৩৫২৪।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৪৬।
১৩. মুসনাদ আহমাদ, হা/১১৬১।
১৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, (বৈরূত প্রকাশিত), ১/৩৩৭।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/১১৫।
১৬. ফাতহুল বারী, ১/২১১।
১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯।

জীবনের মূল্যবান বিষয়ের প্রতি যত্নশীল হোন

-মূল: শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর

*-অনুবাদ: আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল হাফীয**

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই। তিনি এক; তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাথীদের উপর।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে উপকারী ইলম শিক্ষা দিন, আর যা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, তা দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন। আমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দিন, আমাদের জ্ঞানকে আমাদের বিপক্ষে দলীল বানিয়েন না; পক্ষে দলীল বানিয়ে দিন— হে মহিমাময়, মহান।

অতঃপর, হে সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ! নবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী, 'তুমি আগ্রহী হও সেসব জিনিসের প্রতি যা তোমাকে (দুনিয়া ও আখেরাতে) উপকার দিবে, আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও'। এটি হচ্ছে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীছের একটি অংশ, যা ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ছহীহ মুসলিমে সংকলন করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'শক্তিশালী ঈমানদার দুর্বল ঈমানদারের তুলনায় আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম ও প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। 'তুমি আগ্রহী হও সেসব জিনিসের প্রতি যা তোমাকে (দুনিয়া ও আখেরাতে) উপকার দিবে, আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, অক্ষম হয়ে যেয়ো না। এমন বলো না যে, যদি আমি (এমন) করতাম তবে এমন হতো; বরং বলো, আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন। তিনি যা চেয়েছেন, তা সম্পাদন করেছেন। কেননা "যদি" শব্দটি শয়তানের কর্মের (দুয়ার) খুলে দেয়'।[১]

উপরিউক্ত হাদীছটির ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন যে, হাদীছটিতে বেশ কিছু ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য, মহান মূলনীতি ও উপকার নিহিত রয়েছে। তারা এই বাক্যের উপর স্থির হয়েছে, নবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তুমি তোমার প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের দিকে অগ্রসর হও! আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো'।

নবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী, 'তুমি আগ্রহী হও সেসব জিনিসের প্রতি যা তোমাকে (দুনিয়া ও আখেরাতে) উপকার দিবে, আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও'। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাক্য, যাতে বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে রয়েছে দুটি মূলনীতির প্রতি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ, যা ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অসম্ভব।

প্রথম নির্দেশ: তাঁর বাণী, 'তুমি আগ্রহী হও সেসব জিনিসের প্রতি যা তোমাকে (দুনিয়া ও আখেরাতে) উপকার দিবে'। এখানে উপকারী উপকরণ ব্যবহার করার ব্যাপারে উৎসাহ রয়েছে, যা ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকার দিবে।

দ্বিতীয় নির্দেশ: তাঁর বাণী, 'আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও'। এখানে উপকরণের দিকে ভ্রুক্ষেপ ও নির্ভর না করা, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা করার প্রতি আহ্বান রয়েছে, যাতে তাঁর সাহায্য, তাওফীক্ব ও সঠিকতা পাওয়া যায়।

হাদীছটিতে তাঁর বাণী 'তুমি আগ্রহী হও সেসব জিনিসের প্রতি যা তোমাকে) উপকার দিবে'। 'তুমি তোমার প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের দিকে অগ্রসর হও'। এ অংশের মাধ্যমে যেসব উপকারী জিনিসের দিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় ধরনের কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা বান্দার যেমন দ্বীনী বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি দুনিয়াবী বিষয়েরও প্রয়োজন রয়েছে।

কাজেই আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বান্দাকে তাঁর দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণকর বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। আর এই আকাঙ্ক্ষার সাথে সাথে উপকরণ ব্যবহার করবে, সঠিক পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে প্রয়াসী হবে, যার মাধ্যমে সে তার মহান অভীষ্টে পৌঁছতে পারবে। আর এসব কাজে একমাত্র মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। কারণ বান্দার (মন্দ থেকে বেঁচে থাকার) কোনো শক্তি ও (কল্যাণ সাধন করার কোনো) ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না।

দ্বীনী কল্যাণকর বিষয়সমূহ দুটি মহান মূলনীতির দিকে ফিরে যায়। (ক) উপকারী জ্ঞান এবং (খ) সৎ আমল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ

---

* অধ্যয়নরত, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪।

﴿كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾ 'তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে' *(আত-তাওবা, ৯/৩৩)*।

হেদায়াত হলো উপকারী জ্ঞান আর সত্য দ্বীন হলো সৎ আমল। উপকারী জ্ঞান হলো যা আল্লাহ তাআলার কিতাব ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করা হয়। এটি অন্তরসমূহকে পরিশুদ্ধ করে, মননকে সংস্কার করেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা নিশ্চিত করে। তাই বান্দা উপকারী জ্ঞান অর্জনে প্রবল প্রচেষ্টা করবে এবং ইলম অর্জনের জন্য প্রতিদিনের কিছু অংশ বরাদ্দ রাখবে। কারও জন্য এটি সমীচীন নয় যে, সে জ্ঞান অর্জন ছাড়া একটি দিন অতিবাহিত করবে। তাইতো নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন ফজর ছালাতের সালাম ফেরানোর পর বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, উত্তম রিযিক্ব, গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি'।[২] এটি সুস্পষ্ট করে দেয় যে, মুসলিম ব্যক্তির দিনের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো উপকারী জ্ঞান।

কাজেই কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য এটা সমীচীন নয় যে, জ্ঞান অর্জন ছাড়াই একটি দিন অতিবাহিত করা। এখান থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, মুসলিম ব্যক্তি উপকারী ইলমের জন্য প্রতিদিনের জন্য একটি প্রোগ্রাম সাজিয়ে নিবেন, যার মাধ্যমে সে ইলমের একটি অংশ অর্জন করবেন, যদিও তা পরিমাণে কম হয়। উপকারী জ্ঞান অর্জন ছাড়া যেন তার কোনো দিনও না কাটে।

অতঃপর আমলের প্রতি আগ্রহী হবে। ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমল করা। যেমনটি আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, يحتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل 'ইলম (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে) আমলের আহ্বান করে। যদি সে তার আহ্বানে সাড়া দেয় (তবে ইলম তার কাছে বহাল থাকে); আর যদি সাড়া না দেয়, তবে সে চলে যায়'।

অতএব, মুসলিম ব্যক্তি আমলে নিজের অংশ থাকার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে, যা তাকে মহান আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো দ্বীনের ফরয ও ওয়াজিব বিধিবিধানের ব্যাপারে সচেষ্ট-যত্নবান হওয়া।

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, 'আমি যা ফরয করেছি তারচেয়ে প্রিয়তর কোনো জিনিস নেই, যার মাধ্যমে বান্দা আমার নিকটবর্তী হতে পারে'।

মুমিন বান্দার জন্য এটা মানানসই নয় ইসলামের ফরয অথবা দ্বীনের ওয়াজিব পরিত্যাগ করে দিন-রাত অতিক্রম করা। বরং তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে ফরয ও ওয়াজিব পালনের মাধ্যমে সর্বাত্মক সচেষ্ট থাকবে। এর আওতাভুক্ত হলো আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা ও তাঁর শাস্তির ভয়ে হারাম ও পাপাচার থেকে দূরে থাকা।

তেমনিভাবে হাদীছে দুনিয়াবী কল্যাণকর কাজের প্রতি আগ্রহী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, 'তুমি আগ্রহী হও সেসব জিনিসের প্রতি যা তোমাকে উপকার দিবে'। এই বাক্য দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ ও আল্লাহর নৈকট্যশীল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। বান্দা তার দুনিয়াবী প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয়, যার দ্বারা সে কল্যাণ সাধন করবে ও দ্বীনী উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে। তবে এই গুরুত্বারোপ যেন সেসব বিষয়কে ছাপিয়ে না যায়, যেজন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন করার জন্য তাকে অস্তিত্ব দেওয়া হয়েছে। আর সেটি হলো মহান আল্লাহর ইবাদত। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ 'আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*।

সর্বোপরি, এই হাদীছটিকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর 'ব্যাপক অর্থবোধক উচ্চাঙ্গের ভাব ও ভাষা বাক্য'-এর পর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হয়। এই হাদীছটি এমন অনেক বড় বড় উপকারিতা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ সতর্কতামূলক বিষয়াবলিতে পরিপূর্ণ, যা থেকে কোনো ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তিই অমুখাপেক্ষী নয়, যা তার দ্বীন ও দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আর আমি আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমার ও আপনাদের দ্বীনকে সংশোধন করে দেন, যা আমাদের সমস্ত বিষয়ের রক্ষাকবজ; আমাদের দুনিয়াকে সংশোধন করে দেন, যা আমাদের আবাসস্থল; আমাদের আখেরাতকে সংশোধন করে দেন, যা আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল; আমাদের জীবনকে কল্যাণকর কাজে সুদীর্ঘ করুন; আমাদের মৃত্যুকে সকল অনিষ্ট থেকে আরামদায়ক করুন। নিশ্চয় তিনি বরকতময়, সুউচ্চ, দু'আ শ্রবণকারী। তিনিই একমাত্র আশার স্থল। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক!

আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত। দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল ছাহাবীদের উপর।

---

২. ইবনু মাজাহ, হা/৯২৫।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমাদের জীবন

*-আব্দুল হাসিব বিন আব্দুর রহমান**

বর্তমান যুগে আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ গর্ববোধ করব কিনা এই নিয়ে মাঝেমধ্যে চিন্তায় পড়ে যাই। আধুনিকতার ছোঁয়া আমাদের জীবনে খুবই বড় আকারে তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। আমাদের চিন্তাধারা আজ তার চার দেয়ালে বন্দি। জীবনের মূল গন্তব্যস্থল আমরা এখনো ঠিক করতে পারিনি। উদ্দেশ্যহীন তরির ন্যায় কোনো কূল-কিনারায় নৌকা ভিড়াতে এখনো আমরা ব্যর্থ। আমরা কি কখনো এই ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠে সফলতার সোপানে আহরণ করার স্বপ্ন বুনি?

যদি এমন কোনো স্বপ্ন আঁকতাম, যে অঙ্কনের প্রতিটি চিহ্ন আমাদের জীবনের একেকটা ধাপ হয়ে সামনে এগোবে! যে ভাবনা আমাদের হৃদয় মলাটে জমে থাকা ময়লার স্তূপ ধুয়ে ঝকঝকে আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া দিনের মতো করে তুলবে। রাসূল ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আগ্রহী করে তুলবে আর শরণাপন্ন হওয়া যাবে দয়াময় আল্লাহর কাছে। এমন হলে কতই না ভালো হতো!

এই যুগে অহেতুক ও অনর্থক কাজ করে না এমন লোকের দেখা পাওয়া একটা ভাগ্যের ব্যাপার। ছোট থেকে শুরু করে কিশোর, যুবক, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া ব্যক্তিও দুনিয়ামুখিতা ও অশ্লীলতার মাঝে অবগাহন করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

সাকিবের এক প্রতিবেশী ছিল। তার সাথে পাঠক বন্ধুদেরকেও পরিচয় করিয়ে দেই। তাহলে চলুন, তার জীবনচরিত সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা যাক।

সেই ছোট্ট থেকেই তার লেবাসের অবস্থা বেহাল। মাথার চুল ছিল সমাজে বেমানান। মডার্ন লাইফস্টাইল ছিল তার পছন্দের। তার প্যান্ট যেন মাটি ছুঁয়ে যাবে এমন অবস্থা। অনেকবার টাখনুর নিচে পরিধেয় বস্ত্র পরতে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কে শুনে কার কথা। এই তো সেদিনই ইমাম সাহেব মসজিদে এই বিষয়ে খুব চমৎকারভাবে আলোচনা করলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার পোশাক টেনে চলে (টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরার কারণে), ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না’।[১] এরপর টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারীর ভয়াবহতা বলতে গিয়ে তিনি ﷺ বলেন, مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ‘টাখনুদ্বয়ের নিচে যা পরিধান করা হয়, তা জাহান্নামে যাবে’।[২]

তবু এই কথা তার মনে যেন একবিন্দু পরিমাণও আঁচড় কাটেনি। রাসূল ﷺ পোশাকের বিবরণ সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন, কোনো কিছুই বাদ রাখেননি। রাসূল ﷺ কেমন পোশাক পরিধান করতেন, তাঁর পোশাক কেমন ঢিলেঢালা ছিল, কোন রঙের পোশাক ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, যুদ্ধের ময়দানে কেমন পোশাক পরতেন- এগুলো সবই তো বলা হয়েছে। তবুও তার অন্তর মরুভূমির ন্যায় শুকনো হয়ে আছে। সেই কবে থেকে যে আর্দ্রতার মিলন হয়নি তার হৃদয়ে তা জানি না। এটা ছিল সাকিবের প্রতিবেশীর জীবনের প্রথম চালচিত্র।

দ্বিতীয় পাঠ শুরু করা যায় এবার। বর্তমান যুগে গান-বাজনা, নাচানাচি, নাইট পার্টিতে যাওয়া লোকের অভাব নেই। সাকিবের প্রতিবেশীও ছিল ঠিক ওই রকম। গান-বাজনা ছিল তার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঘুমানোর পূর্বে গান শোনা ছিল তার প্রশান্তির খোরাক। নিশাচর হয়ে কত রাত যে পার করেছে তার কোনো হদিস নেই। কত নিশি পার করেছে মাতলামি করে। নাইট ক্লাবে সাদা পানির বদলে ভিন্ন ধরনের পানীয় ছিল তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। বাড়ি ফিরতে প্রায়ই রাতের অর্ধেক অংশ কেটে যেত। এই নিরন্তর চলাচল ছিল তার জীবনের প্রতিচ্ছবি।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে। মাঠের পাশে আব্দুর রহীম চাচা ছোট্ট টিনের ছাউনির তলে তেলেভাজা বহুপদী খাদ্য তৈরিতে ব্যস্ত। সে কিছু আইটেম অর্ডার করে বসে গেল বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে। কথার ফাঁকে কেউ একজন বলে উঠল, আজকে পূর্বপাড়ায় জালসা হচ্ছে। চলো যাওয়া যাক সবাই মিলে। যেই বলা সেই কাজ। সকলেই সম্মত হয়ে চটজলদি চলতে লাগল পূর্বপাড়ার জালসার উদ্দেশ্যে।

তারপর বাদামসহ আরও কয়েক রকমের খাবার কেনা হলো। এরপর প্যান্ডেলের পিছন দিকের এক কোনায় তারা সবাই মিলে বসে পড়ল। বিরতিহীনভাবে চলছে তাদের খাওয়াদাওয়া। এদিকে কেউ কেউ আবার মনোযোগ দিয়ে বক্তার মুখপানে

* অধ্যয়নরত, আলিম ২য় বর্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৮৪।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৭৯৩।

চেয়ে অধীর আগ্রহে তার কথাগুলো শুনছে। মনে হচ্ছে যেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলা হচ্ছে।

এদিকে সাকিবের প্রতিবেশী রাকিব বেশ কিছুক্ষণ থেকেই কুরআন-হাদীছের আলোচনা শোনায় মনোনিবেশ করেছে। কেন জানি আজ সে খুবই আগ্রহ সহকারে বক্তব্য শুনছে। আমরা কীভাবে ফেতনার জালে আটকে গেছি, সে বিষয়ে বক্তব্য হচ্ছে। যুবকরা আজ গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে মনে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে। কুরআন পড়া হতে আজ তারা বহুদূরে। তাদের প্রিয় পাঠ্য বইয়ের তালিকায় কুরআন একদম নিচে, তাও আছে কি-না সন্দেহ। এভাবেই চলছে বক্তব্য...।

বক্তা সাহেব বাদ্যযন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে বেশ কিছু হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেমন:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

আবূ মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য, গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে’।[৩]

এসব বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করা রয়েছে। একদা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এক পথ ধরে হেঁটে চলছেন, পথিমধ্যে কোনো এক দিক থেকে ভেসে আসছিল বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। এতে তিনি তাঁর কানে আঙুল ঢুকিয়ে দেন। যাতে করে গানের আওয়াজ তাঁর কানে না আসে।

আর আজ আমরা তাঁর বাতলে দেওয়া পথ হতে কত দূরে সরে গেছি! তিনি গানের আওয়াজ যাতে না শুনতে পান এজন্য কানে আঙুল ঢুকিয়েছিলেন আর আমরা গান শোনার জন্য কানে এয়ারফোন ঢুকিয়ে দেই!

এবার আসা যাক নেশার ভয়াবহতার কথায়। এসব কথায় রাকিবের মনের ভেতরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। সাথে সাথে তার জানার আগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সজাগ হয়ে সে নড়েচড়ে বসল। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ শুধুই বক্তার প্রতি। বক্তা সাহেব বলছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَبِيتَنَّ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ , وَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-পানীয় ও অসার-অনর্থক ও আমোদ-প্রমোদে রত অবস্থায় রাত্রি যাপন করবে। অতঃপর তাদের সকাল হবে শূকর ও বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে’।[৪]

এই হাদীছটি যেন রাকিবের কাজের সাথে শতভাগ মিল আছে। রাকিবের তা আর বুঝতে দেরি হয়নি। তারপর আলোচনার এক পর্যায়ে বক্তা সাহেব আরও কিছু হাদীছ উল্লেখ করেন,

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَاسْتَحَقَّ الْعَذَابَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ قال الله تعالى وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ.

উছমান (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা নেশাদার দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকো। কেননা নেশাদার দ্রব্য হচ্ছে অশ্লীল কর্মের মূল। যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকে না, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করার কারণে সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়’। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমালঙ্ঘন করে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি’।[৫]

সেই জাহান্নামের ভয়াবহতা ও তার আগুনের তীব্র উত্তাপের কথা রাকিব আগে থেকেই কিছুটা জানত। সেগুলোই ছিল তার অন্তরে ভীতি সঞ্চারের মূল কারণ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَرْضَ اللهُ عَنْهُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মদ পান করবে, আল্লাহ তার উপর ৪০ দিন সন্তুষ্ট হবেন না’।[৬]

এভাবেই রাতের মধ্যভাগে জালসার সমাপ্তি ঘটল। মানুষেরা দলে দলে বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছে। স্বেচ্ছাসেবকরাও তাদের কাজ করে যাচ্ছে। প্যান্ডেলের এরিয়ায় কোনো লোক

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০।

৪. সিলসিলা ছাহীহা, হা/১৬০৪, ২৬৯৯।

৫. নাসাঈ, হা/৫৬৬৬।

৬. আহমাদ, হা/২৭৬৪৪; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৩৪১০।

চোখে পড়ছে না। তবে রাকিব এখনও একই জায়গায় আগের মতোই বসে আছে।

রাকিব বিষণ্ন মনে কিছুক্ষণ পর বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করে। একা রাস্তায় যাচ্ছে আর ভাবছে, জীবনটা কতই না নির্বুদ্ধিতায় বশীভূত হয়ে কাটিয়েছে! অশ্লীলতার কাজে জড়িয়ে ভুলে বসেছে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে! আমার এ পাপরাশি কি মোচন হবে কখনো? আমি কি ক্ষমা পাবার যোগ্য? এমন আরও সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে পৌঁছল বাড়িতে। তার ব্যাকুল মন ঘুমাতে চায় না। তবুও চোখের পাতা টিপটিপ করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঠিক সেদিনই ফজরের ছালাত মিস হয়নি রাকিবের। তবুও তার মাথায় তার অপকর্মের কথাগুলো বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। চিন্তা আর অস্থিরতায় সময় পার করছে সে। সরু ললাটে এখন তার চিন্তার ভাঁজ দেখা যায়।

উঠানের গাছতলায় রাকিবকে বিষণ্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখে সাকিব তাকে জিজ্ঞেবস করল, কী হয়েছে রাকিব ভাই? এমন বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন আপনাকে?

রাকিব তার সমস্ত কথা সাকিবকে বলে। সাকিব তাকে আশ্বস্ত করে। বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ১০০ মানুষকে হত্যা করেছিল, তারপরও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন, এই ঘটনাটা শুনায়। আরও বলে, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি সীমাহীন দয়াশীল। তিনি তাঁর অফুরন্ত রহমত হতে কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি বান্দাকে ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। এভাবে সাকিব তাকে বেশ কিছু কথা বলতে থাকে। তাকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। রাকিব এখন প্রতিদিন ছালাত আদায় করে। অশ্লীলতার ধারেকাছেও সে আর যায় না। তার মনে বিষণ্নতা আর নামে না।

সম্মানিত পাঠক! আমরাও অনেক সময় সঠিক কোনো গাইডলাইন না থাকায় বিষণ্নতায় ভুগি। তাহলে চলুন, আপনাদের বিষণ্নতার অবসান ঘটানো যাক।

জীবনের ভার আর সইতে পারছেন না? দিনমণির লালিমা বিদায় নিতেই রাতের তমসার মতো ছেয়ে যাচ্ছে আপনার জীবন? জীবনের কূল হারিয়ে ফেলেছেন স্রোতের মাঝে? ক্লান্তি, হতাশা, দুঃখ-কষ্ট এসে বাসা বেঁধেছে আপনার মনের ছাউনিতে? কোনো উপায় না পেয়ে জড়োসড়ো হয়ে আশার হাত গুটিয়ে নিয়েছেন? কী ভাবছেন? আপনার পাহাড়সম পাপ মিটানোর মতো কেউ নেই? কেউ নেই কি এমন, যিনি আপনার সব দুঃখ-কষ্ট মুছে মণিমুক্তার মতো উজ্জ্বল করে দিবে আপনার জীবন?

জীবনের তরিতে আর বইতে হবে না পাপের বোঝা। চিন্তার কোনো কারণ নেই। অবশ্যই! এমন একজন আছেন, যিনি আপনার সব দুঃখ-কষ্টের কথা জানেন। আপনার মনের মধ্যে যে কালবৈশাখীর ঝড় বইছে, তিনি জানেন সেটার কথাও। আপনার হৃদয়মলাটে যে বিন্দু পরিমাণ পঙ্কিলতা রয়েছে, তারও খবর তাঁর কাছে আছে। বেলা ফুরাবার আগে এসে হাযির হন তাওবাকারীদের একজন হয়ে। অন্যজন যখন ঘুমে ব্যস্ত, তখন উঠে পড়ুন, দুই রাকআত ছালাত আর চোখের অশ্রুতে সিক্ত হোক আপনার জায়নামায। লম্বা আবদারের দরখাস্ত উঠে আসুক একান্ত মুনাজাতে। ছোট থেকে ছোট সবকিছু চাওয়া হোক তাঁর কাছে। সবসময় আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। সর্বক্ষেত্রে বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন, حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক’। আপনার সব দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়ে আপনার জীবন হয়ে উঠবে ইলাহী আলোয় উদ্ভাসিত একটি আলোকিত জীবন। জীবনে আসবে মহান রবের অদৃশ্য সান্নিধ্য। আল্লাহ আমাদের জীবনকে তাঁর রঙে রঙিন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

মৌচাক মধু

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন-০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

মৌচাক মধু কালোজিরা ও জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

মৌচাক মধু কালোজিরার তেল ১০০% খাঁটি ১০০% গ্যারেন্টি ভেজাল প্রমানে দশ হাজার টাকা পুরষ্কার

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

লাইসেন্স নং রাজশাহী-৫৫১৮

যোগাযোগ

প্রত্যাশা লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলাও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

ধৈর্যশীল হোন!

-মমিনুল ইসলাম বিন আলী আকবর*

ছবর (صبر) আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো ধৈর্য, ছবুর ও সহনশীলতা। পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن لطم الخد وشق الجيب ونحوهما 'ছবর হলো— বিপদের সময় অন্তরকে অস্থিরতা থেকে, জিহ্বাকে অভিযোগ থেকে, আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আঘাত করা, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত রাখা'।[১] ছবর বা ধৈর্য সম্পর্কে ইবনু আজীবাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ধৈর্য ঈমানের জন্য মাথার মতো, দেহ থেকে মাথা কেটে ফেললে যেমন দেহ মারা যায়, তেমনি ধৈর্য চলে গেলে ঈমানও শেষ হয়ে যায়'।[২]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ধৈর্য মানবজীবনে অপরিসীম ও সীমাহীন গুরুত্ব বহন করে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ 'হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৩)*।

হে মুসলিম ভাই! আপনি আপনার সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন। ধৈর্য হলো মানবজীবনের সফলতার হাতিয়ার। মানুষের প্রতিটি কাজ নির্ভর করে ধৈর্যের উপর।

এই পৃথিবীতে যে যত বেশি আল্লাহভীরু, তার উপর বিপদ তত কঠিন। বিপদে পতিত হলে আমাদের বিচলিত হওয়া যাবে না; বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ যাকে বেশি ভালোবাসেন, তাকে বেশি বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন।

কোনো মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন সে মনে করে যে, হয়তো আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন না, আমার কল্যাণ চান না; যদি কল্যাণ চাইতেন, তাহলে কেন আমাকে এত বিপদ দিয়েছেন? আমাদের এই ধারণা নিতান্তই ভিত্তিহীন, যেমনটি আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী থেকে জানতে পারি। শুধু তাই নয়, মানুষ আরও বলে, আমি তো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, দান-ছাদাক্বাও করি; তবুও কেন আমার উপরই আল্লাহ বিপদ দেন? এই কথাটি অজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বলে না। যেমনটি আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী থেকে জানতে পারি। এই মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দুঃখ-কষ্টে ফেলেন'।[৩]

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ, জানমাল ও সন্তানসন্ততির ক্ষতি দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেছেন। আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী পড়লে এমন অনেক ঘটনা দেখতে পাই। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বার নিকটে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছিলেন আর কুরাইশের একদল লোক তাদের মজলিসে উপবিষ্ট ছিল। তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলল, তোমরা কি এই লৌকিকতা প্রদর্শনকারীকে দেখছ না? তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে অমুক গোত্রের উট যবেহ করার স্থানে গিয়ে সেখান হতে গোবর, রক্ত ও নাড়িভুঁড়ি নিয়ে আসবে, অতঃপর অপেক্ষা করবে। যখন তিনি সিজদায় যাবেন, তখন এগুলো তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দিবে? এ কাজের জন্য তাদের চরম দুর্ভাগা ব্যক্তি (উক্ববা ইবনু আবী মুআইত) উঠে দাঁড়াল (এবং তা নিয়ে আসল)। যখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজদায় গেলেন, তখন সে তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজদায় স্থির রয়ে গেলেন। এতে তারা পরস্পর হাসাহাসি করতে লাগল। এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ের উপর লুটোপুটি করতে লাগল। (এ অবস্থা দেখে) এক ব্যক্তি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি ছিলেন ছোট বালিকা। তিনি দৌড়ে চলে এলেন। তখনও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজদায় স্থির ছিলেন। অবশেষে তিনি (ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা) সেগুলো তাঁর উপর হতে ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের লক্ষ্য করে তিরস্কার করতে লাগলেন।[৪]

শুধু তাই নয়, আমরা ছহীহ বুখারীর আরেকটি হাদীছ পড়লে বুঝতে পারি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কাফেরদল কীভাবে নির্মমভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে। একদিন ছালাতরত অবস্থায় উক্ববা ইবনু আবী

* অধ্যয়নরত, আলিম ১ম বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. মাদারিজুস সালিকিন, ২/১৬৮।

২. আল-বাহরুল মাদীদ ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ, ১/৪৫৭; আল-হিদায়াহ ইলা বুলূগিন নিহায়াহ, ১/৮৮১।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪৫; মিশকাত, হা/১৫৩৬।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫২০।

মুআইত এসে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর গলায় জোরে কাপড় পেঁচিয়ে ধরল, যাতে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যান! জনৈক ব্যক্তি চিৎকার করে গিয়ে খবর দিলে আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু ছুটে এসে পেঁচানো কাপড় খুলে দিলেন এবং বদমাশগুলোকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, ‘তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন আমার প্রভু আল্লাহ? তিনি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের কাছে আগমন করেছেন। এ সময় তারা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে ছেড়ে আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বেদম প্রহার করে’।[৫]

প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি একটু ভেবে দেখুন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমন কঠিন বিপদে পড়েও ধৈর্যহারা হননি। আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল ও ধৈর্যধারণ করে তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করেছেন।

তিনি অন্ধকার থেকে আলোর পথে, জাহান্নাম থেকে জান্নাতের পথে মানুষকে নিয়ে এসেছেন। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পরশপাথরের ছোঁয়ায় জাহেলী যুগের অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষগুলোকে আদর্শ ও সোনার মানুষে পরিণত করেছেন। পৃথিবীতে চলার ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করেন, এর মানে এই নয় যে, আল্লাহ বান্দার ক্ষতি চান। আল্লাহ যে মানুষকে মহামূল্যবান জান্নাতে দিবেন, তা কি কোনো প্রকার পরীক্ষা ছাড়াই দিবেন? আল্লাহ দেখতে চান বান্দা আমার জন্য সব অবস্থাতে প্রস্তুত আছে কি-না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ‘আমরা তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে শুভ সংবাদ দাও’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫)*।

শুধু তাই নয়, আমরা যদি আরও কিছু শতাব্দী পূর্বে দেখতে যাই, তাহলে ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর সন্তান হারানোর কঠিন মুহূর্তে উত্তম ধৈর্যধারণ করার নমুনা দেখতে পাই। বালক ইউসুফ আলাইহিস সালাম একদিন তার পিতা ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর কাছে এসে বললেন, ‘আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ১১টি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে’। একথা শুনে পিতা বললেন, বৎস! তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্নের বর্ণনা করো না। তাহলে ওরা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু *(ইউসুফ, ১২/৪-৫)*।

১০ জন বৈমাত্রেয় ভাই মিলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য তাকে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নিল। তারা একদিন পিতা ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর কাছে এসে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে সাথে নিয়ে পশু চরাতে যাওয়ার প্রস্তাব করল। তারা পিতাকে বলল যে, আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে আমাদের সঙ্গে যাবে, সানন্দে ঘোরাফেরা করবে আর খেলাধুলা করবে, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব’। জবাবে পিতা বললেন, ‘আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে আর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে’। তারা বলল, ‘আমরা এক দল লোক থাকা সত্ত্বেও যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে তো আমরা সকলেই অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হব’ *(ইউসুফ, ১২/১২-১৮)*।

যাহোক, ছেলেদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তিনি রাজি হলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে তাদের সাথে পাঠান। কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছেই শয়তানী চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্য তারা তৎপর হয়ে উঠল। তারা ইউসুফকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন বড় ভাই ইয়াহুদা তাদের বাধা দিল। অবশেষে বড় ভাই প্রস্তাব করল, বেশ! তবে ওকে হত্যা করো না; বরং ঐ দূরের একটা পরিত্যক্ত কূপে ফেলে দাও, যাতে কোনো পথিক এলে ওকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তাতে তোমাদের দুটি লাভ হবে— ১. সে পিতার কাছ থেকে দূরে যাবে এবং তোমরা তখন পিতার নিকটবর্তী হবে। ২. নিরপরাধ কাউকে হত্যা করার পাপ থেকে বেঁচে যাবে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে অন্ধকার কূপে ফেলে দিয়ে দলটি ছাগলছানা যবেহ করে তার রক্ত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর পরিত্যক্ত জামায় মাখিয়ে তারা সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরল এবং কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এলো এবং বলল, হে পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখেছিলাম। এমতাবস্থায় বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। এ সময় তারা তার মিথ্যা রক্তমাখানো জামা হাযির করল। এটা দেখে ইয়াকূব আলাইহিস সালাম অবিশ্বাস করে বললেন, ‘কখনোই নয়, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কথা তৈরি করে। অতএব, উত্তম ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা কিছু বললে তাতে আল্লাহই আমার একমাত্র সাহায্যস্থল *(ইউসুফ, ১২/১৬-১৮)*।

প্রিয় মুসলিম ভাই! দেখুন ইয়াকূব আলাইহিস সালাম কোনো প্রতিবাদ না করে ধৈর্যধারণ করলেন। তাই আমাদের সকল বিপদাপদে ধৈর্য ধরতে হবে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ধৈর্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন- আমীন!

---

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৭৮।

শায়খ রাবী বিন হাদী আল-মাদখালী রাহিমাহুল্লাহ (১৯৩৩-২০২৫)

*-সংগৃহীত ও পরিমার্জিত: ড. যায়নুল আবেদীন বিন নুমান মাদানী**

ভূমিকা: ইসলামী বিশ্ব সম্প্রতি হারিয়েছে এক উজ্জ্বল আলেম, নির্ভরযোগ্য ইমাম এবং হাদীসশাস্ত্রের এক জীবন্ত মানদণ্ড— আল্লামা শায়খ রাবী বিন হাদী আল-মাদখালী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন সঊদী আরবের একজন প্রাজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট গবেষক ও যুগের অন্যতম মুজাদ্দিদ। হাদীছশাস্ত্রে তাঁর অবদান তাঁকে এই শতাব্দীর খ্যাতনামা মুহাদ্দিছদের কাতারে স্থান দিয়েছে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন পাঠদান ও গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষ করে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সালাফী মানহাজের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ১৪৪৭ হিজরীর ১৪ মুহাররম (৯ জুলাই ২০২৫) তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে ইলমী অঙ্গন এক অপূরণীয় ক্ষতির মুখে পড়েছে।

জন্ম ও প্রারম্ভিক জীবন: শায়খ রাবী রাহিমাহুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন সঊদী আরবের জাযান প্রদেশের আল-জারাদিয়া গ্রামে, ১৩৫১ হিজরীতে (১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন নিজ এলাকার আলেমদের কাছে। কুরআন, তাজবীদ ও প্রাথমিক ইসলামী জ্ঞান অর্জনের পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমান মদীনায়।

শিক্ষাজীবন ও বৈশিষ্ট্য: স্নাতক: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীআহ বিভাগ থেকে ১৯৬৪ সালে 'মুমতাজ' গ্রেডে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। মাস্টার্স ও ডক্টরেট: মক্কার কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে মাস্টার্স ও ১৯৮০ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। মাস্টার্স থিসিস— ইমাম মুসলিম ও ইমাম দারাকুতনী-এর তুলনামূলক হাদীছ বিশ্লেষণ। ডক্টরেট গবেষণা— النكت على كتاب ابن الصلاح —হাদীছশাস্ত্রের মূলগ্রন্থগুলোর এক যুগান্তকারী সমালোচনা।

শিক্ষাগুরুগণ: তাঁর সৌভাগ্য ছিল এমন সব মহান আলেমদের সাহচর্য পাওয়ার, যাঁরা আজকের ইসলামী জ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন— শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ —তাঁদের কাছ থেকে তিনি শুধু ইলম নয়, পেয়েছেন দাওয়াহর প্রকৃত আদব ও মানহাজ।

শিক্ষকতা ও দাওয়াতী ভূমিকা: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগে অধ্যাপনা করেন দীর্ঘ সময়। একই সঙ্গে উচ্চতর গবেষণা বিভাগেও দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ছাত্ররা আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দাওয়াহ, ফতওয়া ও হাদীছ শিক্ষার ময়দানে কাজ করছেন।

তিনি ছিলেন এমন একজন চিন্তানায়ক যিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং সালাফী মানহাজের ব্যাখ্যা ও রক্ষায় অসামান্য অবদান রেখেছেন।

রচনাসমূহ: তাঁর লেখাগুলো স্পষ্ট, দলীলভিত্তিক ও হক্ব-বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণে অগ্রগণ্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো—الحد الفاصل بين الحق والباطل (সত্য ও মিথ্যার সীমা নির্ধারণকারী), منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله (নবীদের দাওয়াহর পদ্ধতি), النكت على كتاب ابن الصلاح (ইবনে ছালাহের রচনার বিশ্লেষণ), مدارك النظر (রাজনীতির ইলমী ও মানহাজী দৃষ্টিভঙ্গি), الانتصار لأهل الحديث (আহলুল হাদীছদের পক্ষে দলীলসমৃদ্ধ জবাব)।

সালাফী আন্দোলনে অবদান: শায়খ রাবী ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি এই যুগে সালাফী মানহাজের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকারী হিসেবে বিশ্বজুড়ে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। তাঁর কণ্ঠে ছিল বাতিলের বিরুদ্ধে সাহসী উচ্চারণ, আক্বীদা ও মানহাজের প্রশ্নে ছিল আপসহীন অবস্থান।

তিনি ছিলেন সালাফী ভাবধারার অন্যতম রক্ষাকর্তা, জারহ ও তা'দীলের যুগপরিচিত নাম এবং বর্তমান শতকের ইমামদের অন্যতম।

সম্মান ও স্বীকৃতি: শায়খ ইবনে বায, শায়খ উছায়মীন, শায়খ আলবানী প্রমুখ তাঁর ইলম, বোধশক্তি ও মানহাজিক স্থিরতার প্রশংসা করেছেন।

বিশ্বজুড়ে তার ছাত্ররা তাঁর আদর্শ ও গবেষণাকে অনুসরণ করে দাওয়াতী অঙ্গনে কাজ করে যাচ্ছেন।

মৃত্যু ও জানাযা: ৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। ১০ জুলাই (১৫ মুহাররম) সকালে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় মদীনার মসজিদে নববীতে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য আলেম, ছাত্র, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অতিথিবৃন্দ। তাঁকে জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

স্মৃতিচারণ: শায়খ নিজেই একবার আবেগভরে বলেছিলেন, 'যখন শায়খ ফাওজান এবং শায়খ লুহাইদান মারা যাবেন, তখন দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যাবে। আমি চাই তাদের আগেই যেন মারা যাই...'। তাঁর এ বাণী এখন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। তিনি আজ আর নেই। তবে তাঁর রেখে যাওয়া দাওয়াত, গবেষণা ও চিন্তাধারা যুগ যুগ ধরে উম্মাহর জন্য মশাল হয়ে থাকবে, ইনশা-আল্লাহ।

উপসংহার: আল্লামা শায়খ রাবী বিন হাদী আল-মাদখালী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন এমন এক ইমাম, যাঁর ইলম, প্রজ্ঞা, সাহসিকতা ও মানহাজিক স্থিরতা যুগস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি যেমন বাতিলের বিরুদ্ধে কলম ধরতে দ্বিধা করেননি, তেমনি হক্বের পথে অবিচল থেকেছেন আমৃত্যু। তাঁর মৃত্যু শুধু সালাফী অঙ্গন নয়, পুরো ইসলামী জগতের জন্য এক বেদনাবিধুর অধ্যায়।

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন এবং তাঁর রেখে যাওয়া ইলমকে কবুল করুন- আমীন!

* লিসান্স, হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

পাঠশালায় একদিন...

*-মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার**

আমরা তো পাঠশালায় গিয়ে কত দুষ্টুমি করি, খেলাধুলা করি, হৈ-হুল্লোড় করি। ক্লাস ফাঁকা পেলেই গালগল্প জুড়ে দিই। শিক্ষক ক্লাসে আসার পরও তার চোখ ফাঁকি দিয়ে কতশত দুষ্টুমি করি। যেগুলো কেউ হয়তো জানতেও পারে না। শিক্ষক বারবার বলেন, মনোযোগ দিয়ে বই ধরতে; কিন্তু আমরা পাশের জনের সাথে চুপিসারে গল্প করতে মজে থাকি। কে শোনে কার কথা? আবার কখনো যদি শিক্ষক বলেন, আজকে অনেক পড়াব, কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না; তখন আমরা বারবার প্রশ্ন করে শিক্ষকের পড়ানোর গতি মন্থর করে দিই। শিক্ষক আমাদের এসব দুষ্টুমি ধরে ফেলার পরও কখনো ছাড় দেন, আবার কখনো ভালোবাসা মিশানো হালকা করে বকা দিয়ে আবার পড়ানো শুরু করেন। আবার কখনো কখনো অজানাকে জানার জন্য আমাদের মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে, যার কারণে শিক্ষকের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বারবার প্রশ্ন করে বসি, ভুলে যাই শিক্ষকের নিষেধাজ্ঞার কথা।

বন্ধুরা চলো, এরকমই একটি গল্প শুনে আসি আজকে। গল্পটি অনেক পুরোনো হলেও বেশ মজার। শিক্ষক তার ছাত্রকে বারবার করে বলে দিলেন যে, কোনো প্রশ্ন করা যাবে না; কিন্তু না, ছাত্রের সে কথা মনেই থাকে না। যার কারণে বারবার প্রশ্ন করে বসে। শেষ পর্যন্ত শিক্ষক কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ছাত্রের ব্যাপারে? চলো! আমরা শুনে আসি আমাদের প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত বাণী থেকেই।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বনী ইসরাঈলের জনগণের সামনে মূসা আলাইহিস সালাম একদিন বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান। তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, মানুষের মাঝে কে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী? তিনি জবাব দেন, আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। এতে আল্লাহ তাআলা তাকে তিরস্কার করেন। কেননা তিনি জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলার দিকে সম্পৃক্ত করেননি।

তখন আল্লাহ তাআলা তার নিকট অহী পাঠান, দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে আমার এক বান্দা আছে, যিনি তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী।

* কুল্লিয়া ২য় বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি কী উপায়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করব? আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি ঝুড়িতে একটি মাছ নাও। মাছটি যেখানে হারিয়ে ফেলবে, তিনি সেখানেই আছেন।

অতএব, তিনি রওনা হলেন এবং তার সাথে এক যুবক রওনা হলেন, তার নাম ইউশা ইবনু নূন। মূসা আলাইহিস সালাম ঝুড়ির মধ্যে একটি মাছ ভরে নিলেন। অতঃপর মূসা আলাইহিস সালাম ও সেই যুবক পায়ে হেঁটে রওনা দেন। অতঃপর তারা প্রকাণ্ড এক পাথরের নিকট আসেন এবং এখানে মূসা আলাইহিস সালাম ও যুবক দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েন। এসময় ঝুড়ির মধ্যকার মাছটি নড়াচড়া করে ঝুড়ির বাইরে এসে সমুদ্রের পানিতে পতিত হয়'।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মাছ থেকে পানির স্রোতধারা বন্ধ করে দেন। ফলে তা টানেলের মতো হয়ে যায় এবং মাছটির জন্য এভাবে একটি পথের ব্যবস্থা হলো। মূসা আলাইহিস সালাম ও যুবকের নিকট এটা খুবই আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল। অতঃপর তারা সেই পুরো দিন ও রাত পথ চলেন। মূসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গী মাছের বৃত্তান্ত সম্পর্কে তাকে জানাতে ভুলে যান। ভোর হলে মূসা আলাইহিস সালাম তার সঙ্গীকে বললেন, আমাদের সকালের খাবার নিয়ে আসো। আমাদের এই সফরে আমরা অনেক ক্লান্তির মুখোমুখি হয়েছি' *(আল-কাহফ, ১৮/৬২)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তাদেরকে যে স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই স্থান অতিক্রম না করা পর্যন্ত তারা ক্লান্ত হননি'।

'যুবক বললেন, আপনি দেখেছেন কি আমরা যখন সেই প্রস্তরের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন মাছটি বিস্ময়করভাবে সাগরে তার পথ গ্রহণ করে নিয়েছে। আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম আর এটি স্মরণ করতে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমরা তো এটাই অন্বেষণ করছি' *(আল-কাহফ, ১৮/৬৪)*। তারপর তারা দুজনেই তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে আসেন'।

সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, লোকজন মনে করেন যে, সেই পাথরের নিকট আবে হায়াতের ঝরনা রয়েছে, সেই পানি মৃত কোনো কিছুকে স্পর্শ করলে তা জীবিত হয়ে

যায়। তিনি বলেন, সেই মাছের কিছু অংশ খাওয়া হয়েছিল, অতঃপর যখন সেটার উপর আবে হায়াতের পানির ফোঁটা পড়ে, তখন সেটি জীবিত হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তারা উভয়ে তাদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে পাথরের নিকট এসে পৌঁছান, অতঃপর সেখানে তারা চাদরে আবৃত এক ব্যক্তিকে দেখতে পান। মূসা আলাইহিস সালাম তাকে সালাম দিলেন। তিনি বললেন, আপনার যমীনে কি এই সালামের প্রচলন রয়েছে? তিনি বললেন, আমি মূসা।

তিনি প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে মূসা! নিশ্চয়ই আপনার নিকট আল্লাহ তাআলার এমন ইলম রয়েছে, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই আর আল্লাহ তাআলা আমাকেও ইলম শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানেন না।

'মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা শেখার উদ্দেশ্যে কি আমি আপনার সাথে থাকতে পারি? তিনি বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না আর যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে আপনি কীভাবে ধৈর্য ধারণ করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ চান তো, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পাবেন আর আমি আপনার কোনো ব্যাপারেই বিরোধিতা করব না' *(আল-কাহফ, ১৮/৬৬-৬৯)*।

খাযির আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, 'আপনি যদি আমার সাথে চলতে চান, তবে আপনি আমার নিকট কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি আপনাকে নিজের থেকে তা বর্ণনা করি' *(আল-কাহফ, ১৮/৭০)*। তিনি (মূসা) বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে।

খাযির ও মূসা আলাইহিমাস সালাম সমুদ্রের তীর ধরে পায়ে হাঁটতে থাকলেন। তাদের পাশ দিয়ে একটি নৌকা অতিক্রম করছিল। তারা উভয়ে তাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে নৌকায় তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তারা খাযিরকে চিনে ফেলল এবং কোনো ভাড়া ছাড়াই তাদের দুজনকে নৌকায় তুলে নিল। খাযির নৌকার একটি তক্তা খুলে নিলেন।

তখন মূসা আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, 'তারা আমাদেরকে ভাড়া ছাড়াই নৌকায় তুলে নিল আর আপনি নৌকাটির একটি তক্তা খুলে ফেললেন, যাতে আপনি তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারেন। আপনি তো একটি ন্যক্কারজনক কাজ করলেন!

খাযির বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না? মূসা বললেন, আমার ভুলে যাওয়ার জন্য আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারটিকে আপনি কঠিন করে ফেলবেন না' *(আল-কাহফ, ১৮/৭১-৭৩)*।

তারা নৌকা হতে নেমে সমুদ্রের তীর ধরে হেঁটে চলছিলেন, এসময় তারা এক বালককে দেখতে পান, যে অন্য বালকদের সাথে খেলাধুলা করছে। খাযির আলাইহিস সালাম ছেলেটির মাথা হাত দিয়ে ধরে তা ছিন্ন করে দিলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। মূসা আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, একটা নিষ্পাপ বালককে আপনি মেরে ফেললেন! অথচ সে তো কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো বড় অন্যায় কাজ করলেন! খাযির বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?' *(আল-কাহফ, ১৮/৭৪-৭৫)*।

বর্ণনাকারী বলেন, পূর্বের কথার চেয়ে এ কথাটা বেশি শক্ত ছিল। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'অতঃপর আমি যদি আপনার নিকট কোনো প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আমার পক্ষ থেকে আপনার কাছে ওযর পৌঁছেছে। পুনরায় তারা রওনা দেন, অতঃপর তারা এক জনপদের অধিবাসীর কাছে আসেন এবং সেখানকার মানুষদের নিকট খাবার চান। কিন্তু তারা মেহমান হিসেবে তাদের মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর তারা সেখানে একটি দেয়াল দেখতে পান, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল' *(আল-কাহফ, ১৮/৭৬-৭৭)*। বর্ণনাকারী বলেন, দেয়ালটি ঝুঁকে পড়েছিল। খাযির আলাইহিস সালাম হাত দিয়ে এরকম করেন। অতঃপর তিনি তা ঠিক করে দেন।

মূসা আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসলাম, যারা আমাদেরকে মেহমান হিসেবেও গ্রহণ করেনি এবং আমাদেরকে খেতেও দেয়নি। আপনি ইচ্ছা করলে এই কাজের জন্য অবশ্যই মজুরি নিতে পারতেন।

খাযির বললেন, এটাই আপনার ও আমার বিচ্ছেদ (এর সময়)। আপনি যেসব বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, অচিরেই আমি আপনাকে সেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা বলে দিব' *(আল-কাহফ, ১৮/৭৭-৭৮)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ʻআলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর রহম করুন। আমাদের আশা হয় যে, যদি তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন; তাহলে তাদের আরও কিছু বৃত্তান্ত তিনি বর্ণনা করতেন’। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ʻআলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মূসা আলাইহিস সালাম শর্তের কথা ভুলে যাওয়ার কারণেই প্রথম প্রশ্নটি করেছেন। তিনি বলেন, একটি চড়ুই পাখি এসে তাদের নৌকার কিনারে বসে, তারপর তা সমুদ্রে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়।

তখন খাযির তাকে (মূসা আলাইহিস সালাম-কে) বললেন, এই চড়ুই পাখি সমুদ্রের পানি যতটুকু কমিয়েছে আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহ তাআলার জ্ঞানভাণ্ডার হতে ততটুকুই কমিয়েছে’।[১]

মূসা আলাইহিস সালাম খাযির আলাইহিস সালাম-কে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেগুলোর ব্যাখ্যা হলো- নৌকাটি কিছু দরিদ্র ব্যক্তির ছিল, তারা সাগরে কাজ করত, আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে। কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগ করে প্রত্যেকটি (ভালো) নৌকা ছিনিয়ে নিত’ *(আল-কাহফ, ১৮/৭৯)*।

আর কিশোরটির পিতামাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমরা আশঙ্কা করলাম যে, সে সীমালঙ্ঘন ও কুফরীর দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তাই আমরা চাইলাম যে, তাদের রব যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় উত্তম ও দয়া-মায়ায় ঘনিষ্ঠতর’ *(আল-কাহফ, ১৮/৮০-৮১)*।

আর ঐ প্রাচীরটি ছিল নগরবাসী দুই ইয়াতীম কিশোরের এবং এর নিচে আছে তাদের গুপ্তধন। তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। কাজেই আপনার প্রতিপালক চাইলেন যে, তারা পরিণত বয়সে পৌঁছাক এবং তাদের গুপ্তধন নিজেরাই বের করুক। এটা আপনার প্রভুর দয়া আর আমি নিজ থেকে কিছু করিনি। এটা হলো সেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা, যাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি’ *(আল-কাহফ, ১৮/৮২)*।

শিক্ষা:

১. নিজেকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী মনে না করা।

২. প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে জানা না থাকলে ‘আল্লাহু আ‘লাম’ বা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন বলা।

৩. ব্যক্তি যতই সৎ হোক না কেন ভুলে যাওয়াটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়।

৪. ব্যক্তি যতই জ্ঞানী হোক তারপরও আরও বেশি জ্ঞানার্জন করা মুস্তাহাব।

৫. মাদরাসায় ছাত্র ভর্তি নেওয়ার সময় তার থেকে অঙ্গীকার নেওয়া বৈধ।

৬. সফরে কাউকে সঙ্গী হিসেবে নেওয়া মুস্তাহাব। যেমন- মূসা আলাইহিস সালাম ইউশা আলাইহিস সালাম-কে সাথী হিসেবে নিয়েছিলেন।

৭. সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য যদি কোনো দূর দেশে ভ্রমণ করতে হয়, তবে তা-ই করতে হবে।

৮. শিক্ষকের সাথে ভদ্রতা বজায় রাখা। কখনো ভুল বা বেয়াদবী হয়ে গেলে মাফ চেয়ে নেওয়া।

৯. কেউ মেহমান হলে তাকে আপ্যায়ন করানো ওয়াজিব।

১০. কোনো বিষয় বাহ্যিকভাবে দেখেই হুকুম না দেওয়া, বরং রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করা।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু	অন্যান্য জিনিস
সরিষা ফুলের মধু	আখের গুড়
লিচু ফুলের মধু	মৌসুমের খেজুরের গুড়
বরই ফুলের মধু	মধুময় বাদাম
কালোজিরা ফুলের মধু	উন্নত মানের খেজুর
মিক্স ফুলের মধু	সরিষার তেল
পাহাড়ী ফুলের মধু	কালোজিরা তেল
সুন্দরবন বিখ্যাত খলিশা ফুল	জয়তুন তেল
চাকের মধু	যবের ছাতু
	দানাদার ঘি
	বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২
প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun
১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

---

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪০১; ছহীহ মুসলিম, হা/৬০৫৭; তিরমিযী, হা/৩১৪৯।

হিংসা

-সুমাইয়া আক্তার
মালেকাটোলা দাশ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা।

হিংসা করা ভালো নয়,
হিংসা মানবাধিকার করে ক্ষয়।
আলোর জীবন করে কালো,
মুছে দেয় জীবনের সব ভালো।
পুণ্য সব দেয় মুছে
মানবিকতা যায় ঘুচে।
জীবনের হয় অধঃপতন
জীবন হয়ে যায় পশুর মতন।
সমাজ ভরে যায় অবিশ্বাসে
দুর্দশা ছড়ায় প্রতি নিঃশ্বাসে।
সরিষা পরিমাণও থাকিলে হিংসা
বেড়ে যাবে শত্রুতা ও জিঘাংসা।
আঁধারে ভরে গেলে এই ভূলোক
কী করে চলবে পথ হারালে দিবালোক।
তাই শত্রুতা সব যাও ভুলে
চলে এসো নৈতিকতার মূলে।
মানুষ জাতি পরস্পরের আপন
পরস্পরের সহযোগিতায় সুন্দর হবে জীবন।

ধন্য জীবন

-আব্দুল বারী
পন্ডিতপুকুর, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে, শয়তান থেকে যিনি রক্ষা দেন,
শুরু করি তাঁরই নামে, করুণায় যাঁর হৃদয় ভরে যায় সর্বক্ষণ।
প্রাণের চেয়ে প্রিয় হোক ঈমান, সেই হোক জীবনের আলো,
নেক আমলে আলোকিত হবে ক্বলব, হৃদয় হবে ভালো।

জাহান্নামের পথঘাট ঘেরা লোভ-লালসার জালে,
জান্নাতের পথ কঠিন, তবুও হই সকলে সতর্ক চালে।
কুরআন-হাদীছ আমাদের জীবনের চূড়ান্ত অনুষঙ্গ,
ভ্রান্ত মত ও পথ নয়, চাই সঠিক জ্ঞানের সঙ্গ।
কুরআন ও সুন্নার আলোকে বলি মোরা প্রতিটি কথা,
রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখানো পথেই পাই সফলতা।
তাঁর তরিকায় জীবন গড়ি, একনিষ্ঠ আল্লাহর তরে,
তবেই তো ধন্য হবে এ জীবন, জন্ম হবে সার্থক করে।

ঘুমপাড়ানি রাষ্ট্র

-বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম
৬ষ্ঠ শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

যখন সারা বিশ্বে উত্তেজনা
চলছে প্রযুক্তিযুদ্ধ,
এক দেশের সাথে আরেক
দেশের সীমানা অবরুদ্ধ।
তখন ঘরে-বাইরে ব্যস্ত
মোরা পদ-পদবি নিয়ে,
নির্বাচনী প্রচারণা চালাই
গ্রামে গ্রামে গিয়ে।
অন্যরা সব পাঠায় রকেট
স্যাটেলাইট মহাবিশ্বে,
আমরা করি চামচামি
আর তেলবাজি প্রকাশ্যে।
তাদের আছে বিজ্ঞান
মেডিকেল, মহাকাশ গবেষণা,
আর মোদের আছে তিপ্পান্ন
বছরের এক বাসি চেতনা।
যেখানে অন্যরা সব ড্রোন
মিসাইল, এয়ার ডিফেন্স বানায়,
সেখানে অজস্র সহ-সভাপতি
আর নেতা মোদের পাড়ায় পাড়ায়।
ওরা গড়ে বিজ্ঞানী, গবেষক
আর কৃত্রিম সৈনিক,
আমরা গড়ি ক্যাডার বাহিনী
ঘুষ নেয় দৈনিক।
মোদের মেধাগুলো হারিয়ে যে যায়
বিসিএস হলরুমে,
কাঁচা টাকা দিলে কিছু ক্যাশ
বাকিটা কাগজ-কলমে।
জেগে ওঠো তোমরা যত
তরুণ প্রাণের দল,
জয় করে সব আকাশ মাটি
বাতাস কিংবা জল।
বুকে রাখো রক্তে লেখা
এই মাটিরই ঋণ,
ঘুমপাড়ানি রাষ্ট্র কাঁপুক
জাগুক আগামীর দিন।

বাংলাদেশ সংবাদ

দেশে চালু হচ্ছে ইসলামী মুদ্রা ও মূলধন বাজার

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের তারল্য সংকট নিরসনে বড় পদক্ষেপ: ইসলামী ব্যাংকিং খাতের দীর্ঘদিনের তারল্য সংকট কাটাতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে ইসলামী মুদ্রা বাজার ও ইসলামী মূলধন বাজার। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

এ দুটি নতুন আর্থিক উপকরণ চালু হলে শরীআহভিত্তিক ব্যাংকগুলো পরস্পরের মধ্যে সূদবিহীন ভিত্তিতে ধার-লেনদেন করতে পারবে, যা তাদের দ্রুত তারল্য সংকট নিরসনে সহায়তা করবে। বর্তমানে প্রচলিত কল মানি মার্কেট কিংবা প্রচলিত ব্যাংকগুলো থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলো ধার নিতে পারে না, কারণ এসব লেনদেন সূদনির্ভর।

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কেবল ব্যাংকিং খাতেই নয়, ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার অন্যান্য শাখাগুলোর (যেমন ইসলামী পুঁজিবাজার, তাকাফুল বা ইসলামী বিমা, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা) ক্ষেত্রেও নতুন গতি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বর্তমানে কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক পুঁজিবাজারে সক্রিয় এবং সীমিত পরিসরে ইসলামী বিমা চালু রয়েছে, তথাপি এসব খাতকে আরও সম্প্রসারণের সুপারিশ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বর্তমানে মোট ব্যাংকিং আমানতের ২৪ শতাংশেরও বেশি এবং বিনিয়োগের ২৮ শতাংশেরও বেশি ইসলামী ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণে। তবে চাহিদা অনুযায়ী গ্রামীণ শাখা বিস্তৃত হয়নি। শহরের তুলনায় গ্রামে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের চাহিদা বেশি হলেও, সে অনুযায়ী সম্প্রসারণ হয়নি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাই ইসলামী ব্যাংকগুলোকে গ্রামীণ শাখা ও প্রচারণা বাড়াতে এবং কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে উৎসাহিত করছে। পাশাপাশি, মহিলা উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক ও সরকারি আর্থিক প্রকল্পে অংশগ্রহণের দিকেও ইসলামী ব্যাংকগুলোকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে চালু হওয়া সুকুক বন্ড ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে ইসলামী অর্থনীতির টেকসই ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

ইরান-ইসরাঈল যুদ্ধ: পশ্চিমা শক্তির নৈতিক পরাজয়

২০২৫ সালের ১৩ জুন থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত সময়কালে বিশ্ব এক নাটকীয় ও রক্তাক্ত দ্বন্দ্বের সাক্ষী হয়, যখন ইসরাঈল ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ইরানের বিরুদ্ধে তিনটি বিস্তৃত সামরিক অভিযান চালায়। এই অভিযানের নাম ছিল যথাক্রমে— অপারেশন নার্নিয়া, অপারেশন রাইজিং লায়ন এবং অপারেশন মিডনাইট হ্যামার।

বিশেষ করে 'অপারেশন নার্নিয়া' ছিল মোসাদের দীর্ঘ ১৫ বছরের পরিকল্পনার ফসল। এর মূল লক্ষ্য ছিল—ইরানের পরমাণু কর্মসূচির মূল বিজ্ঞানীদের গোপনে হত্যা করে দেশটির পারমাণবিক সক্ষমতাকে দীর্ঘমেয়াদে বিপর্যস্ত করা। ১৯৯৮ সালে পাকিস্তানের পারমাণবিক সফলতার পর ড. কাদের খান তাঁর প্রযুক্তিগত চক্রের মাধ্যমে ইরানসহ অন্তত আটটি রাষ্ট্রে সেন্ট্রিফিউজ ডিজাইন ও পরমাণু প্রযুক্তি সরবরাহ করেন। ২০০৩ সালে লিবিয়ার নেতা গাদ্দাফি পশ্চিমাদের সন্তুষ্ট করতে নিজের পারমাণবিক কর্মসূচি ত্যাগ করেন এবং সেই সূত্রে ইরানের গোপন কর্মসূচির তথ্য প্রকাশ পায়। এরপর থেকেই ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ একটি বিস্তৃত গুপ্তচর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে এবং বিজ্ঞানীদের গতিবিধি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ শুরু করে।

২০২৫ সালের ১৩ জুন, এই গুপ্তচরবৃত্তির চূড়ান্ত রূপ নেয় অপারেশন নার্নিয়া-তে। তেহরানে একযোগে ৯ জন শীর্ষ পারমাণবিক বিজ্ঞানীকে হত্যা করা হয়। এর কিছুদিন পর ইসরাঈল শুরু করে অপারেশন রাইজিং লায়ন, যার লক্ষ্য ছিল ইরানের সামরিক ঘাঁটি ও পরমাণু স্থাপনাগুলিতে হামলা, শীর্ষ সামরিক নেতাদের হত্যা ও কৌশলগত সুবিধা অর্জন।

২২ জুন যুক্তরাষ্ট্র শুরু করে তাদের হামলা—অপারেশন মিডনাইট হ্যামার—যার আওতায় ইউএস এয়ার ফোর্স এবং নেভি ইরানের গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু স্থাপনায় বিমান হামলা চালায়। এসব হামলার ফলে নাতাঞ্জ, ফোরদো ও ইসফাহানের মতো প্রধান পরমাণু স্থাপনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইরানের তেল ও গ্যাস অবকাঠামোতেও অগ্নিকাণ্ড ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে।

এদিকে ইরানও পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় অপারেশন ট্রু প্রমিস-৩ বা 'ওয়াদা-ই-সাদিক' নামে ইসরাঈলের বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়।

ইসরাঈলি ও মার্কিন অভিযানে ইরানে প্রাণ হারায় প্রায় ৯৩৫ জন, যার মধ্যে ৩৮ শিশু ও ১৩২ নারী অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীন পর্যবেক্ষক সংস্থা HRANA-এর হিসেবে নিহতের সংখ্যা ১,১৯০ জন, যার মধ্যে ৪৩৬ জন বেসামরিক নাগরিক, ৪৩৫ জন সামরিক সদস্য এবং ৩১৯ জনের পরিচয় অজ্ঞাত। আহতের সংখ্যা ৩,৪৫০ থেকে ৪,৭৫০-এর মধ্যে।

অন্যদিকে, ইরানের হামলায় ইসরাঈলে নিহত হয় মাত্র ২৯ জন, যার মধ্যে ২৮ জনই বেসামরিক নাগরিক। আহত হয় ৩,২৩৮ জন। তাদের মধ্যে ২৩ জন গুরুতর, ১১১ জন মাঝারি এবং প্রায় ২,৯০০ জন হালকা আহত। ইসরাঈলি সূত্র মতে, ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দেশটির ৫ বিলিয়ন শেকেল (প্রায় ১.৪৭ বিলিয়ন ডলার) মূল্যের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া যুদ্ধজনিত সর্বমোট ব্যয় ১২ বিলিয়ন ডলার ছাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকরা ৩৮,৭০০টি ক্ষতিপূরণ আবেদন জমা দিয়েছেন।

ইসরাঈলি হামলায় ইরানের উচ্চ পর্যায়ের সামরিক নেতৃবৃন্দ—জেনারেল মোহাম্মদ বাঘেরি, আইআরজিসি প্রধান হোসেইন সালামি এবং কুদস ফোর্সের শীর্ষ কর্মকর্তারা নিহত হন। তাছাড়া ইরানের প্রায় ৬৫% ব্যালিস্টিক মিসাইল লঞ্চার ও ৮০০–১,০০০ মিসাইল ধ্বংস করা হয় বলে ইসরাঈল দাবি করেছে।

এই যুদ্ধে ইরান সামরিক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়লেও, রাজনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকে ইসরাঈল ও পশ্চিমা জোটের দুর্বলতা উন্মোচিত হয়। গোয়েন্দা ব্যর্থতা, প্রচার-যুদ্ধের বিভ্রান্তি এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইসরাঈলের সহানুভূতির অভাব—সবই এ যুদ্ধের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিশ্ব রাজনীতিতে এ যুদ্ধ এক নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত দেয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রকাশ্যেই ইসরাঈলের পক্ষ নেয়, পক্ষান্তরে রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া ও মুসলিমবিশ্বের বড় একটি অংশ ইরানকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানায়। এই বৈপরীত্য শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, কূটনৈতিক অঙ্গনেও নতুন উত্তেজনার জন্ম দেয়।

সবশেষে, এই যুদ্ধ প্রমাণ করেছে—শুধু সামরিক শক্তি নয়, বরং নৈতিকতা, প্রতিরোধ এবং জনসমর্থনও যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে। ইরান যেখানে জ্বলন্ত আগুনের ভেতর দাঁড়িয়ে প্রতিরোধের মশাল উঁচিয়ে ধরেছে, সেখানে পশ্চিমা বিশ্বের নৈতিক অবস্থান এক গভীর প্রশ্নের মুখে।

মুসলিম বিশ্ব

পানিবিহীন গাযা: শিশুদের সামনে মৃত্যুর হুমকি

গাযায় পানীয় জলের সংকট ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। চলমান যুদ্ধের ধাক্কায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। এই পরিস্থিতিকে রাষ্ট্রসংঘের শিশু সংস্থা ইউনিসেফ 'মানবসৃষ্ট খরা' বলে অভিহিত করেছে। ২০২৫ সালের ২০ জুন, শুক্রবার জেনেভায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ইউনিসেফ মুখপাত্র জেমস এল্ডার সতর্ক করে বলেন, 'শিশুরা তৃষ্ণায় মারা যেতে শুরু করবে'। বর্তমানে গাযায় মাত্র ৪০ শতাংশ পানীয় জল উৎপাদন কেন্দ্র কার্যকর রয়েছে।

এই সংকটের মধ্যেও ইসরাঈল দাবি করেছে, তারা গাযায় ত্রাণ প্রবেশে বাধা দিচ্ছে না; বরং নিশ্চিত করছে যাতে তা হামাসের হাতে না পড়ে। তবে হামাস এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, ইসরাঈল 'ক্ষুধাকে অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করছে।

ফিলিস্তীনি শরণার্থীদের সহায়তায় নিয়োজিত রাষ্ট্রসংঘ সংস্থা UNRWA-এর প্রধান ফিলিপ লাজারিনি বর্তমান ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাকে 'লজ্জাজনক এবং আমাদের সামষ্টিক বিবেকের ওপর কলঙ্ক' বলে উল্লেখ করেছেন।

গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইসরাঈলি সামরিক অভিযানে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫৫,৬০০ ফিলিস্তীনি নিহত হয়েছেন। এছাড়াও প্রায় পুরো অঞ্চলটির মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়েছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভয়াবহ খাদ্যসংকট।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) জানিয়েছে, গত চার সপ্তাহে তারা গাযায় মাত্র ৯,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করতে পেরেছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, 'ক্ষুধা ও অনাহারের আতঙ্কে মানুষ পরিবহণপথে ভিড় করছে— হয়তো কিছু সাহায্য ছিনিয়ে নিতে পারবে এই আশায়। জীবনরক্ষাকারী সহায়তা পেতে গিয়ে কেউ আহত বা নিহত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য'।

গাযায় চলমান মানবিক সংকট দিন দিন আরও গভীরতর হচ্ছে। বিশেষত শিশুদের জন্য পরিস্থিতি হয়ে উঠছে ভয়াবহ। এই পরিস্থিতি থামাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর ও জরুরী হস্তক্ষেপ এখন সময়ের দাবি।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

কৃত্রিম রক্ত তৈরি করলেন জাপানি বিজ্ঞানীরা: রক্ত সংকটে নতুন আশার আলো

জাপানের নারা মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা কৃত্রিম রক্ত তৈরিতে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছেন। হিরোমি সাকাইয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এমন কৃত্রিম রক্তকোষ তৈরি করেছেন, যা যেকোনো রক্তের গ্রুপেই ব্যবহারযোগ্য—এমনকি বিরল রক্তের ক্ষেত্রেও। যদি এটি সফলভাবে প্রয়োগ করা যায়, তবে রক্ত সংকটের দিন শেষ হতে পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহুদিন ধরেই কৃত্রিম রক্ত তৈরির প্রচেষ্টা চলছিল। এর আগে ২০২০ সালে আমেরিকার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেলথ এবং ২০২২ সালে কিছু পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ঘটলেও, দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর রক্ত তৈরি সম্ভব হয়নি। তবে এবার জাপানি বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, তাদের তৈরি কৃত্রিম রক্ত শুধু কার্যকরই নয়, এটি স্বাভাবিক রক্তের তুলনায় অনেক দিন সংরক্ষণযোগ্যও।

গবেষণার প্রাথমিক ধাপে ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবকের শরীরে ১০০ থেকে ৪০০ মিলিলিটার কৃত্রিম রক্ত প্রয়োগ করে মানবদেহের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যদিও এই রক্ত দেখতে লোহিত কণিকার মতো নয়, তবে এটি শরীরের কোষে অক্সিজেন পরিবহণ করতে সক্ষম।

বিশেষত বড় অস্ত্রোপচার, দুর্ঘটনা বা বিরল রক্তের রোগীদের ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম রক্ত হতে পারে এক যুগান্তকারী সমাধান। তবে গবেষকেরা সতর্ক করে দিয়েছেন, এটি এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি বা স্বাভাবিক রক্তের সঙ্গে মিশে জটিলতা তৈরির সম্ভাবনা এখনো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই উদ্ভাবন সফল হলে চিকিৎসাক্ষেত্রে এটি হবে এক ঐতিহাসিক অগ্রগতি।

কেমো ছাড়াই ক্যানসার কোষে বিপ্লব: কোরিয়ান গবেষণায় সুস্থ কোষে রূপান্তরের পথ

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী অগ্রগতি! ক্যানসার কোষকে ধ্বংস না করেই সুস্থ কোষে রূপান্তরের এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা। এই গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন অধ্যাপক কোয়াং হিউন চো এবং তাঁর গবেষণা দল। তাঁদের উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তিতে কেমোথেরাপির মতো কঠিন ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াপূর্ণ চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে না। বরং, এটি ক্যানসার কোষের আচরণ পাল্টে দিয়ে তাকে সুস্থ কোষের মতো ব্যবহার করতে শেখায়।

গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে উন্নত কম্পিউটারভিত্তিক প্রযুক্তি ‘ডিজিটাল টুইন’, যার মাধ্যমে কোষের অভ্যন্তরে জিনগত যোগাযোগের নিখুঁত নকশা তৈরি করা হয়। এই প্রযুক্তির মূল শক্তি একটি বিশেষ অ্যালগরিদম— বেনাইন (Boolean Network Inference and Control)। এটি কোষের মধ্যে কোন কোন জিন কীভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করে, তা বিশ্লেষণ করে এবং বোঝায়, কোন জিনগুলোর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করলে কোষের আচরণ পরিবর্তন করে সুস্থতার দিকে ফেরানো সম্ভব।

গবেষণায় বিজ্ঞানীরা অন্ত্রের ৪,০০০-এরও বেশি ক্যানসার কোষ বিশ্লেষণ করে প্রায় ৫০০টিরও বেশি জিন শনাক্ত করেন। সেই বিশ্লেষণ থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জিন— MYB, HDAC2 ও FOXA2— চিহ্নিত করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যদি এই তিনটি জিন একযোগে ‘নকড-ডাউন’ (অর্থাৎ কার্যকারিতা বন্ধ) করা হয়, তবে ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি থেমে গিয়ে তা সাধারণ কোষের মতো আচরণ করতে শুরু করে।

এই পদ্ধতির কার্যকারিতা পরীক্ষাগারে এবং প্রাণিদেহে সফলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত এসব কোষ ইঁদুরের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হলে দেখা গেছে, সৃষ্ট টিউমার আগের তুলনায় ছোট ও কম ক্ষতিকর হয়েছে। আরও বিস্ময়কর বিষয় হলো, ঐ কোষগুলোতে সুস্থ অন্ত্র কোষের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

এই প্রযুক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— এটি শুধু ক্যানসার নয়, মস্তিষ্কের কোষের বিকাশ এবং রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ টি-সেল সম্পর্কেও কার্যকর জিন শনাক্তে সক্ষম হয়েছে।

যদিও গবেষকরা সতর্ক করে বলছেন, সব ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসায় এই পদ্ধতি কতটা কার্যকর হবে এবং এর প্রভাব কতদিন স্থায়ী হবে— তা জানতে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তবুও, এই আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। ভবিষ্যতের ক্যানসার চিকিৎসা হয়তো কেমোথেরাপি ছাড়াও নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাবে।

দাওয়াহ সংবাদ

সা‘দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা : ব্যাচ নং- ০৮

দ্বীন শিখতে আগ্রহী জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের জন্য সালাফী শায়খদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থেকে দ্বীন শিক্ষার এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে ‘আদ-দাওয়া ইলাল্লহ’। এবারের দ্বীন শিক্ষার আসর ছিল আরও ব্যতিক্রম, যা ছিল এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য স্পেশাল কোর্স। গত ১৪ই জুন, ২০২৫ ইং থেকে ৩০শে জুন, ২০২৫ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জ্ঞানপিপাসু এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থী দ্বীনি ভাইয়েরা ‘আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহীতে একত্রিত হয়ে একটানা ‘২০ দিন মেয়াদী’ বাংলাদেশের বিদগ্ধ উলামায়ে দ্বীনের সান্নিধ্যে থেকে হাতে-কলমে সঠিক দ্বীনের জ্ঞান, আক্বীদা-আমল, আদব-তারবিয়াত শিখেন। শবগুজারীর মাধ্যমে ইবাদতে অভ্যস্ত হন। নির্দিষ্ট সিলেবাস ও রুটিন মাফিক কোর্সটি বিনামূল্যে তারা গ্রহণ করেন। কোর্সে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে ৩২ জন দ্বীনী ভাই অংশগ্রহণ করেন। ‘নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন’-এর অধীন পরিচালিত ‘আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ’ এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন’-এর সহ-সেক্রেটারি ও ‘আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ’-এর সম্মানিত পরিচালক-২ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর শিক্ষকবৃন্দ ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর দাঈগণ— আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুল আহাদ, হাসান আল-বান্নাহ মাদানী, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। কোর্স সমাপ্তান্তে সঊদী শায়খগণ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল ছালাতের প্র্যাকটিকেল প্রশিক্ষণ, যা মাহবুবুর রহমান মাদানী প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা অতীব স্বাচ্ছন্দ্যে তা উপভোগ করেন এবং ছালাত শিক্ষায় অনেক উপকৃত হন। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে কোর্সটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণকালীন মাঠ পর্যায়ে তৃণমূল মানুষের কাছে কীভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে হয় তা প্র্যাকটিক্যাল করানো হয়। দাঈদের দুটি দলে বিভক্ত করা হয়। একদল রাজশাহীর পবা উপজেলা এবং অপরটি নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন মহল্লায় দাওয়াতী কার্যক্রমে অংশ নেন।

মুয়াদালাভুক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা : ব্যাচ নং- ০২

আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী, জুন, ২০২৫ ইং: আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী, দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সালাফী বিদ্যাপীঠ। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সালাফী বিদ্যাপীঠসমূহ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের সিলেবাসের আলোকে প্রণীত ও অনুসৃত অনন্য সিলেবাস। এই ধারায় জাতিকে পথ দেখাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ‘আল-জামিয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ’-এর মুয়াদালাভুক্ত হয়। তাই সেই চাহিদার প্রেক্ষিতে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও পঠন মানোন্নয়নে ‘নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন’-এর শিক্ষা বিভাগ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ ইং সালের ৩১শে মে থেকে ৫ই জুন পর্যন্ত, মোট ৬ দিনব্যাপী একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন আল-জামি‘আহ-এর মুয়াদালাভুক্ত প্রায় ২৪টি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত শিক্ষকগণ। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল— শিক্ষকদের পাঠদানে দক্ষতা বৃদ্ধি, আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান, শ্রেণিকক্ষে কার্যকর উপস্থাপন কৌশল শেখানো এবং ইসলামী ও অ্যাকাডেমিক শিক্ষার ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশনাকে জোরদার করা। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আলোচিত মূল বিষয়সমূহ— পাঠ পরিকল্পনা ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব ও আচরণগত দিক, আধুনিক শিক্ষণ কৌশল ও উপস্থাপনা, আক্বীদা ও মানহাজ সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনা, দাওয়াত ও আদর্শ শিক্ষক চরিত্র গঠনের দিক। প্রশিক্ষকগণ এই কর্মশালায় জ্ঞানগর্ভ ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর অভিজ্ঞ ও গুণী শিক্ষকবৃন্দ— শায়খ মাহবুবুর রহমান মাদানী, শায়খ আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, শায়খ মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ প্রমুখ। প্রশিক্ষণের সমাপনী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ও

হৃদয়স্পর্শী সমাপনী দারস প্রদান করেন 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সহ-সেক্রেটারি ও 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-এর সম্মানিত পরিচালক-২ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। তিনি দ্বীনী শিক্ষার তাৎপর্য, শিক্ষকের দায়বদ্ধতা এবং সালাফে ছালেহীনের আদর্শ অনুযায়ী পাঠদান ও দাওয়াতের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এই ৬ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি শিক্ষকগণের মাঝে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করে। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, এমন প্রশিক্ষণ বারবার আয়োজন করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষকরা যুগের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রকৃত ইসলামী চিন্তা ও সালাফী মানহাজ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।

মৃত্যু সংবাদ

দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী রাহিমাহুল্লাহ-এর বিদায়

'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-এর সম্মানিত সিনিয়র মুহাদ্দিছ, দেশবরেণ্য সালাফী আলেমে দ্বীন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত'-এর মুহতারাম আমীরে জামাআত, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাবেক সিনিয়র নায়েবে আমীর ও 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী মাদনী (৮৭) গত ১৮ জুন, ২০২৫ ইং, রোজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইনতিকাল করেন *(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পরদিন তিনটি জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়— ১ম জানাযা সকাল ৮টায় আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী, ২য় জানাযা সকাল ১১টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ও ৩য় জানাযা দুপুর ১:৩০ মিনিটে সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং জানাযা শেষে নিজ গ্রামে সমাহিত করা হয়। জানাযায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী রাহিমাহুল্লাহ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সারাংপুর মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী ইউনিয়নে। দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পর তিনি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রথমে পাকিস্তানের করাচিস্থ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহতে এবং পরে সঊদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং সেখান থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভের পর তিনি সঊদী সরকারের মাবঊস (প্রেরিত দাঈ) হিসেবে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ, মাদরাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহতে অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও সর্বশেষ সুস্থ থাকাকালীন অবস্থা পর্যন্ত আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহতে সিনিয়র মুহাদ্দিছ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ শিক্ষকতা পেশায় তৈরি করেছেন হাজারো আলেমে দ্বীন, যারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সফল সংগঠক। দীর্ঘদিন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন; দায়িত্বপালনকালে দেশের আনাচে-কানাচে দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, 'তাওহীদ ট্রাস্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা, মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত'-এর আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সংগঠনটির আমীর হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর থাকা অবস্থায় ২০০৫ সালে তিনি ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় কারাবরণ করেন এবং প্রায় দেড় বছর কারানির্যাতন ভোগ করেন। সাংগঠনিক কাজে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হওয়ার পরও দাওয়াতী কাজে আপসহীন ভূমিকা পালন করেন।

আল্লাহ তাআলা শায়খের গুনাহখাতা ক্ষমা করুন, তাঁর দ্বীনি খেদমত কবুল করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন। সেই সাথে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): অনেকেই জিন ব্যবহার করে বিভিন্ন সেবা দেয়, যেমন: কাবীরাজি, তাবীয, ঝাড়ফুঁক, চিকিৎসা ইত্যাদি। এসব কাজ কি ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ?

-বদরুদ্দোজা
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: জিনের সাহায্য নেওয়া হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর কতিপয় মানুষ কতক জিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত, ফলে তারা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত’ (আল-জিন, ৭২/৬)। জিনের সাহায্য নেওয়া হয় কুফরী অথবা শিরকী পন্থায়, যেমন: জিনের পূজা, কুফরী শব্দ উল্লেখের মাধ্যমে তাবীয করা। এগুলো দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এজন্য জিনদের সাহায্যে কাবীরাজি, তাবীয বা চিকিৎসা করা যাবে না। তবে কুরআন-হাদীছ দ্বারা যারা ঝাড়ফুঁক করে চিকিৎসা নেওয়া যাবে (ছহীহ বুখারী হা/৫৭৩৬)।

প্রশ্ন (২): নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়ে ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উভয়কেই কি আম্মাজান বলা যাবে?

-রাশেদ
ঢাকা।

উত্তর: না, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উভয়কেই ‘আম্মাজান’ বলা যাবে না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ হলেন ‘উম্মাহাতুল মুমিনীন’ বা ‘মুমিনদের মাতা’। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর এবং তঁর স্ত্রীগণ তাদের মা’ (আল-আহযাব, ৩৩/৬)। তাই ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে মা ফাতেমা, উম্মুল মুমিনীন বা আম্মাজান বলা যাবে না।

প্রশ্ন (৩): একজন বক্তা বলেছেন, উছমান ইবনু ছালেহ নামক একজন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর জিন ছাহাবী ছিল। সেটা কতটুকু সঠিক?

-শাহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তর: কুরআন ও হাদীছে জিন জাতির অস্তিত্ব এবং তাদের নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও অনুসারী হওয়ার কথা উল্লেখ আছে (আল-জিন, ৭২/১)। কিন্তু উছমান ইবনু ছালেহ নামক নির্দিষ্ট কোনো জিন ছাহাবীর কথা কুরআন হাদীছে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৪): জান্নাতে কি রাত্রি-দিন আছে?

-ওয়ালিদ ইবনে শামস্
কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তর: জান্নাতে দিন-রাত, সূর্য-চন্দ্র কিছুই থাকবে না। হাসান ও আবূ কিলাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! জান্নাতে কি রাত বা দিন হবে? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘তোমার মধ্যে কে এ ধরনের প্রশ্ন উঠাল?’ সে বলল, আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন, ‘আর সেখানে তাদের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় রিযিক থাকবে’ (মারইয়াম, ১৯/৬২) আর রাত তো আসে সকাল ও সন্ধ্যার মাঝে? উত্তরে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘সেখানে কোনো রাত থাকবে না, থাকবে কেবল আলো আর আলো’ (তাফসীরে কুরতুবী, ১১/১২৭)। অন্য জায়গায় এসেছে, আল্লাহ তাআলার এই বাণী, ‘আর তাদের জন্য সেখানে আছে তাদের রিযিক সকালে ও সন্ধ্যায়’— এ সম্পর্কে যদি কেউ প্রশ্ন করে, জান্নাতে তো দিন-রাত নেই, তাহলে এখানে ‘সকাল’ ও ‘সন্ধ্যা’ বলার অর্থ কী? উত্তর হচ্ছে, এখানে ‘সকাল’ ও ‘সন্ধ্যা’ বলা হয়েছে সময়ের পরিমাপ বুঝাতে অর্থাৎ পৃথিবীর বেলা ও সন্ধ্যার পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অনুযায়ী তাদের রিযিক প্রদান করা হবে (তাফসীরে সাময়ানী, ৩/৩০৩)।

প্রশ্ন (৫): কারো যদি ঈমান ভেঙে যায়, তাহলে সে যদি তওবা করে নিজে নিজে ঈমান আনে, তাহলে কি তার ঈমান আনা আল্লাহর কাছে কবুল হবে? নাকি কোনো হুজুরের মাধ্যমে কালিমা পড়তে হবে?

-মো. রনি মিয়া
কিশোরগঞ্জ।

উত্তর: অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে কারো মাধ্যমে কালিমা পড়বে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি পাপের কারণে ঈমান ভেঙে গেছে মনে করে, তাহলে নিজে নিজে তওবা করে কালিমা পড়ে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলে তা আল্লাহর কাছে কবুল হবে। হুজুর বা আলেমের সামনে পড়া আবশ্যক নয়। কেননা ঈমান আনয়নের জন্য কারো সামনে কালিমা পড়া বা সাক্ষী রাখা আবশ্যক নয়। তাকে বলতে

হবে, 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' (ফাতওয়া শাবাকা ইসলামিয়্যাহ, ১/৩৮২)। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তবে যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহ নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (আল-ফুরকান, ২৫/৭০)।

প্রশ্ন (৬): জান্নাতে কি আল্লাহ নিজে মানুষকে কুরআন পড়ে শুনাবেন?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: এ মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলো যঈফ (যঈফুল জামে, হা/৯৬৪৩ ও ১৮৩৪)। এ ধরনের গায়েবী বিষয় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সুস্পষ্ট দলীল ছাড়া বিশ্বাস করা যাবে না।

প্রশ্ন (৭): কোন কোন কাজ বা কথা মানুষকে কুফরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে? উদাহরণসহ জানতে চাই।

-কাওছার আহমেদ
টাউন হল, ময়মনসিংহ।

উত্তর: বিশ্বাস, কথা ও কর্মের মাধ্যমে মানুষ কুফরী করতে পারে। ১. বিশ্বাস বা আক্বীদাগত কুফরী, যেমন: আল্লাহ বা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর বিশ্বাস না করা, পরকাল, হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস না রাখা ইত্যাদি। ২. কথার মাধ্যমে কুফরী, যেমন: আল্লাহ, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআন বা দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করা বা দ্বীনের কোনো হুকুম, দাড়ি, হিজাব বা ইসলামী পোশাক নিয়ে হাসি-তামাশা করা (আত-তাওবা, ৯/৬৫-৬৬)। ৩. কর্মের মাধ্যমে কুফরী, যেমন: পীর ছাহেবকে বা মাজারে সিজদা করা, কুরআন অবমাননা করা, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যঙ্গচিত্র আঁকা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৮): দেশকে মা বলা যাবে কি? যেমন: ভারত মাতা কি জয়?

-তালহা
খুলনা।

উত্তর: দেশকে মা হিসেবে সম্বোধন করা হিন্দুদের সংস্কৃতি। হিন্দুধর্মে 'ভারত মাতা' একটি দেবী বা মূর্তিরূপে পূজা করা হয়, যা সুস্পষ্ট শিরক। তাই কোনো মুসলিম এগুলো বলতে পারে না। আর দেশকে মা সম্বোধন করার কোনো যুক্তি বা কারণ নেই। ইসলামে মা শুধু তিনিই, যিনি তাকে জন্ম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদের মা তো কেবল তারাই, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে' (আল-মুজাদালা, ৫৮/২)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৯): শুনেছি যে, ওযূ করার পর সেই পানি না মুছে ফেলা পর্যন্ত নাকি বান্দার পাপ ঝরতে থাকে। এমনকি শেষ ফোঁটা পর্যন্ত নাকি বান্দার পাপ ঝরতে থাকে, শরীআতে এমন কোনো কথা আছে কি?

-গোলাম আজম
মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট।

উত্তর: না, ওযূর পর শরীরের লেগে থাকা পানি না মুছা পর্যন্ত পাপ ঝরতে থাকার ধারণাটি সঠিক নয়। বরং হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো মুসলিম কিংবা মুমিন বান্দা ওযূর সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে, তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায় এবং যখন সে দুটি হাত ধৌত করে, তখন তার দুই হাতের স্পর্শের মাধ্যমে সব গুনাহ পানির অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে পা দুটি ধৌত করে, তখন তার দুই পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে ঝরে যায়, এমনকি সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৪)। এজন্য ওযূ শেষে পানি মুছে ফেলা বা না ফেলা মুমিনের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

প্রশ্ন (১০): সন্তানকে দুধ পান করালে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

-রবিউল ইসলাম
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর: যেসব কারণে ওযূ ভেঙে যায় সন্তানকে দুধ পান করানো তার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং সন্তানকে দুধ পান করালে ওযূ ভঙ্গ হয় না। এগুলো বানোয়াট সামাজিক কুসংস্কার।

ছালাত

প্রশ্ন (১১): ফজরের ছালাতের আগে ৬ রাকআত ছালাত, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দুই রাকআত, আযান ও ইকামতের মাঝখানে দুই রাকআত, ফজর এর সুন্নাত দুই রাকআত পড়া যাবে কি?

-মো. শাওন মুন্সি
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর: যেসব ফরয ছালাতের পূর্বে নিয়মিত সুন্নাত নেই, যেমন- এশার ছালাত, এক্ষেত্রে মসজিদে বসার আগে

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়বে। আর যেসব ফরয ছালাতের আগে নিয়মিত সুন্নাত আছে, তা বাড়ি থেকে পড়ে না আসলে মসজিদে ঢুকে নির্দিষ্ট ওয়াক্তের যে সুন্নাত ছালাত রয়েছে তাই আদায় করবে। ঐ সুন্নাত ছালাতই তাহিয়্যাতুল ওযূ, দুখূলুল মাসজিদ ও ছালাতের পূর্বে ছালাতের জন্য যথেষ্ট হবে। আর বাড়ি থেকে সুন্নাত পড়ে আসলে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করবে। প্রথমে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করে পরে ছালাতের সুন্নাত পড়তে হবে এমন আমল ছাহাবী, তাবেঈ হতে প্রমাণিত নয়; বরং ছাহাবীগণ মসজিদে ঢুকে ছালাতের নির্ধারিত সুন্নাত ছালাতই পড়তেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। যখন মুয়াযযিন মাগরিব ছালাতের আযান দিল, তখন তারা (ছাহাবীগণ) তাড়াহুড়া করে খুঁটির নিকট গিয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায় করতেন। এমনকি অপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে অধিক সংখ্যক ছালাত আদায়কারীর কারণে তার মনে হতো যে, মনে হয় (ফরয) ছালাত শেষ হয়ে গেছে (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৩৭; মিশকাত, হা/১১৮০)।

প্রশ্ন (১২): অতিরিক্ত গরম ও পর্যাপ্ত আলো বাতাস না থাকার কারণে মসজিদের মূল কক্ষ ছেড়ে বারান্দায় ইমামসহ ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-আব্দুল হালিম
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর: মসজিদের বারান্দা যদি মসজিদ হিসেবে নির্মিত হয়ে থাকে, তাহলে সেটি মসজিদের হুকুমেই থাকবে। সুতরাং সেখানে ছালাত আদায় করা মসজিদের মাঝেই ছালাত আদায় করা হিসেবে গণ্য হবে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি মক্কায় অবস্থানকালে জুমআর ফরয ছালাত আদায়ের পর নিজ স্থান ত্যাগ করে একটু সামনে এগিয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর আরো একটু সামনে এগিয়ে চার রাকআত আদায় করতেন। আর তিনি মদীনায় অবস্থানকালে জুমআর ফরয ছালাত আদায় শেষে ঘরে ফিরে দুই রাকআত আদায় করতেন। তখন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন (আবূ দাঊদ, হা/১১৩০)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছালাত শুরু করলেই পশ্চিমের দিকে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে হবে, ঠিক তা নয়; বরং যেকোনো স্থানে সুবিধামতো ছালাত আদায় করতে পারে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদ' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭১)।

প্রশ্ন (১৩): বিতর ছালাত আদায় না করলে কি সে কাবীরা গুনাহগার হবে?

-মুহাম্মদ মাইনুল ইসলাম গাজী
চট্টগ্রাম।

উত্তর: না, কাবীরা গুনাহগার হবে না। কেননা এটি ফরয ইবাদত নয়, যা ছেড়ে দিলে শাস্তি দেওয়া হবে। জনৈক ছাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত'। সে বলল, আমার উপর এ ছাড়া আরো ছালাত আছে? তিনি বললেন, 'না, তবে নফল আদায় করতে পার' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৬)। তবে বিতর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। তাই অকারণে বিতর ছালাত ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাড়িতে বা সফরে কোনো অবস্থায় বিতর ও ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না (যাদুল মাআদ, ১/৬০০)।

প্রশ্ন (১৪): হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তির আছরের ছালাত ছুটে গেলে তার যেন পরিবার ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল'। ঘুমের কারণে যদি আছরের ছালাত ছুটে যায় আর ঘুম থেকে উঠেই আছরের ছালাত আদায় করি, সেক্ষেত্রেও কি এই গুনাহ হবে?

-মুরশিদ আলী
মঙ্গলজন, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: অনিচ্ছাকৃত ঘুমের কারণে এই পাপ হবে না। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি কেউ কোনো ছালাতের কথা ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে যায়, তাহলে যখনই স্মরণ হবে, তখন তাকে তা আদায় করতে হবে। এ ব্যতীত সে ছালাতের অন্য কোনো কাফফারা নেই' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৪)। আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আছরের ছালাত ছেড়ে দেয়, তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়'। এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি ছালাতকে অবহেলা করে, এর সময়ের ফযীলতকে তুচ্ছজ্ঞান করে সময়মতো তা আদায় করার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা ছেড়ে দেয়, তার ছালাতের কাজ নষ্ট হয়ে যায় (শারহু ছহীহিল বুখারী, ২/১৭৬)।

প্রশ্ন (১৫): আমার ইচ্ছা আছে একটা মসজিদ বানানোর। কিন্তু আমার একাই তা বানানোর সামর্থ্য নাই। এখন যদি আমি মসজিদ বা প্রতিষ্ঠানে দান করি, তাহলে কি মসজিদ বানানোর ছওয়াব পাব?

-ইমরুল কাইসার
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: কোনো ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণে আংশিক দান করলেও মসজিদ নির্মাণের ছওয়াবের অংশীদার হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করে দেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৩)। আরেক বর্ণনায় এসেছে, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পাখির বাসার ন্যায় বা ছোট ঘরের ন্যায় একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন' (ইবনু মাজাহ, হা/৭৩৮)।

প্রশ্ন (১৬): মুয়াযযিন ইকামত এর শব্দগুলো ২ বার করে বলে, এখন আমরা মুছল্লীরা কি ২ বার করে বলব নাকি ১ বার করে বলব?

-হাসান মোল্লা
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: ইকামতের শব্দ একবার বলাই সুন্নাত ও সঠিক। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আযানকে দুইবার করে এবং ইকামতকে একবার একবার করে বলতে (ছহীহ বুখারী, হা/৬০৫)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে আযানের শব্দ দুইবার করে এবং ইকামতের শব্দ একবার করে বলা হতো। কিন্তু ইকামতের মধ্যে 'কাদ্ ক্বামাতিছ-ছলাহ্' শব্দটি দু'বার বলা হতো (আবূ দাঊদ, হা/৫১০)। সুতরাং ইকামতের শব্দগুলো একবার করেই বলবে এবং তার জবাবে মুছল্লীগণও একবার করেই বলবে।

প্রশ্ন (১৭): রাকআত ছুটে যাওয়ার জন্য মসজিদে জামাআত চলাকালীন দৌড়ে গিয়ে রাকআত ধরা যাবে কি? অনেকেই এমন করে থাকে।

-রাশেদ
ঢাকা।

উত্তর: মসজিদে জামাআত চলাকালীন তাড়াহুড়া করে বা দৌড়ে গিয়ে রাকআত ধরা যাবে না। এব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে, তখন তোমরা স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করে ছালাতের দিকে যাও, তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬)।

প্রশ্ন (১৮): যোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নাত ছালাত কীভাবে পড়তে হয়? দুই দুই রাকআত করে নাকি একসাথে চার রাকআত?

-আব্দুল্লাহ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উত্তর: যেকোনো সুন্নাত ছালাত দুই দুই রাকআত করে পড়তে হবে; একসাথে চার রাকআত নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى 'রাতের এবং দিনের ছালাত দুই দুই রাকআত করে' (আবূ দাঊদ, হা/১২৯৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৭৯১; মুসনাদে দারেমী, হা/১৪৯৯)। আর চার রাকআত একসাথে পড়া যায় মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা হলো, 'যোহরের পূর্বে চার রাকআত যা সালাম না ফিরিয়ে একসাথে পড়া হয়, তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়' (আবূ দাঊদ, হা/১২৭০)। অত্র হাদীছের 'যা সালাম না ফিরিয়ে একসাথে পড়া হয়' এ অংশটুকু যঈফ।

প্রশ্ন (১৯): জুমআর ফরয ছালাতের আগে ও পরে মোট কত রাকআত সুন্নাত পড়তে হবে এবং তার ফযীলত কী?

-ফাহাদ ইসলাম
ঠাকুর দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর: জুমআর ফরয ছালাতের আগে কোনো নির্দিষ্ট সুন্নাত নেই। মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী যত ইচ্ছা ২ রাকআত, ৪ রাকআত বা তার বেশি সুন্নাত ছালাত আদায় করতে পারে। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর ছালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত সুন্নাত ছালাত আদায় করল, অতঃপর ইমামের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল, অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করল, এতে তার দুই জুমআর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয় (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫৭)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, জুমআর আগে নির্দিষ্ট কোনো রাকআত নেই, বরং যত ইচ্ছা সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায়। আর জুমআর পরে মসজিদে চার রাকআত সুন্নাত পড়বে আর বাসায় গিয়ে পড়লে দুই রাকআত পড়বে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি জুমআর ছালাত আদায় করে ফিরে এসে নিজ বাড়িতে দুই রাকআত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮২)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি মক্কায় অবস্থানকালে জুমআর ফরয ছালাত আদায়ের পর নিজ স্থান ত্যাগ করে একটু সামনে এগিয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর আরো একটু সামনে এগিয়ে চার রাকআত আদায় করতেন। আর তিনি মদীনায় অবস্থানকালে জুমআর ফরয ছালাত আদায় শেষে ঘরে ফিরে দুই রাকআত আদায় করতেন। তখন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ করতেন (আবূ দাঊদ, হা/১১৩০)।

প্রশ্ন (২০): ইমাম যখন রুকূ থেকে উঠে আর বলে 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ', তখন কি ইমামের পিছনে মুক্তাদীকেও এই কথা বলতে হবে নাকি শুধু 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বললেই হবে?

-ফরহাদ খান
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: ইমামের পিছনে মুক্তাদী 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন ইমাম বলে, 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ', তখন তোমরা বলো, 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৯৬; মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বা, হা/২৬১৬)। তবে 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ'ও বলতে পারে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় অনুসরণ করার জন্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৮)।

প্রশ্ন (২১): মসজিদে ফজরের ছালাত পড়ে বাসায় গিয়ে ইশরাকের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর: এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর যিকির করবে এবং এরপর দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য একটি হজ্জ ও উমরা পালনের ছওয়াব হবে (তিরমিযী, হা/৫৮৬)। স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে পড়লে পড়তে পারে; তবে হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, এই নেকী পেতে হলে মসজিদেই বসে থাকতে হবে; বাড়িতে আসা যাবে না।

প্রশ্ন (২২): একজন ছালাতরত ব্যক্তির সামনে সুতরা রেখে তার সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে কি?

-মিজানুর রহমান ভূইয়াঁ
ময়মনসিংহ সেনানিবাস।

উত্তর: সুতরার ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের যে কেউ ছালাত আদায় করতে চাইলে যেন সুতরা সামনে রেখে ছালাত পড়ে এবং তার নিকটবর্তী হয়। সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব, যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ সে একটা শয়তান' (ইবনু মাজাহ, হা/৯৫৪)। অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায়, মুছল্লী নিজেই তার সামনে সুতরা দিয়ে ছালাত আদায় করবে। অন্য কেউ তার সামনে সুতরা দিয়ে চলে যাওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। এছাড়া মসজিদে সুতরার ব্যবহারেরও কোনো দলীল নেই। বর্তমানে বিভিন্ন মসজিদে যে সুতরাগুলো রাখা হয় এবং সেগুলোর ব্যবহার হয়, এর কোনো ভিত্তি নেই। মুছল্লী সুতরা গ্রহণ না করলে তার সিজদার জায়গা থেকে এক ছাগল চলাচলের জায়গা বাদ দিয়ে অর্থাৎ আনুমনিক চার হাত স্থান বাদ দিয়ে, তৎপরবর্তী স্থান দিয়ে চলাচল করতে পারে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৮)।

প্রশ্ন (২৩): বৃষ্টির কারণে রাস্তায় পানি উঠলে জামাআতে না গিয়ে বাসায় ছালাত পড়া যাবে কি?

-ইমন হোসাইন
গাজীপুর।

উত্তর: প্রচণ্ড বৃষ্টি, কাঁদাযুক্ত রাস্তা, জলাবদ্ধতা হলে বাসায় পরিবারের সকলকে নিয়ে জামাআতে ছালাত আদায় করা যায়। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর মুয়াযযিনকে এক প্রবল বর্ষণের দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবে, তখন 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' বলবে না; বরং বলবে, 'ছাল্লু ফী বুয়ূতিকুম' (তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে ছালাত আদায় করো)। তা লোকেরা অপছন্দ করল। তখন তিনি বললেন, আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন। জুমআ নিঃসন্দেহে জরুরী, আমি অপছন্দ করি তোমাদেরকে মাটি ও কাদার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলতে (ছহীহ বুখারী, হা/৯০১)।

হজ্জ-উমরা

প্রশ্ন (২৪): মৃত পিতার সম্পত্তি বণ্টনের পর কেউ যদি ঐ টাকা দিয়ে পিতার নামে উমরা বা হজ্জ করার ইচ্ছা করে, তাহলে উমরা বা হজ্জ করা যাবে কি?

-কানব হাসনাত
ঢাকা।

উত্তর: মৃত বা অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওয়ারিছসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে হজ্জ বা উমরা করা যায়। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, খাছআম গোত্রের একজন মহিলা মুযদালিফায় সকালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার পিতার অতি বৃদ্ধাবস্থায় তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না, এমতাবস্থায় আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ' (নাসাঈ, হা/২৬৩৭)।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (২৫): AI (Artificial Intelligence) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা যাবে কি? এর থেকে কোনো সাহায্য নেওয়া যাবে কি?

-তাহমীদ হাসান
গাইবান্ধা।

উত্তর: AI (Artificial Intelligence) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো এমন একটি সিস্টেম যা ডেটা বিশ্লেষণ করে, সমস্যা সমাধান করে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং বিভিন্ন কাজে মানুষকে সাহায্য করে। যদি তা শরীআত বিরোধী কোনো কাজে ব্যবহার না করা হয়, যেকোনো ভালো কাজে বা ভালো উদ্দেশ্যে যেমন: জ্ঞান, গবেষণা, সময় বাঁচানো, উপকারী কোনো কাজে তা ব্যবহার করা বা তার মাধ্যমে সাহায্য নেওয়া বৈধ। AI একটি টুলস মাত্র। এটি কোনো খারাপ কাজে বা উদ্দেশ্যে যেমন, মিথ্যা তথ্য ছড়ানো বা ফেইক ছবি বা ভিডিও বানানো ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়াও AI অনেকসময় ভুল তথ্য দিতে পারে। সুতরাং তার দেওয়া তথ্যের উপর সরাসরি নির্ভর করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখো' (আল-হুজুরাত, ৪৯/৬)।

প্রশ্ন (২৬): ফেসবুকে মেয়েদের কি বন্ধু (Friend) বানানো যাবে বা তাদের সাথে কথা বলা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ ফাহিম
নাটোর।

উত্তর: ফেসবুকে অপরিচিত মেয়েদের বন্ধু বানানো কিংবা তাদের সাথে বিনা প্রয়োজনে চ্যাট করা হারাম। এটি একটি ফিতনা ও বেহায়াপনা। উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পুরুষের জন্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা আমি রেখে গেলাম না' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯৬)। কোনো মেয়েকে বন্ধু বানানো, তার ছবিতে লাইক, কমেন্ট করা বা তার সাথে চ্যাটের মতো হারাম কাজ করার মাধ্যমে শয়তান মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায় ও অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে অবশ্যই তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান অবস্থান করে' (তিরমিযী, হা/২১৬৫)।

প্রশ্ন (২৭): আমাদের এদিকে বিয়ের অনুষ্ঠানে খাবার খাওয়ানোর জন্য পুরুষ ও নারীকে একসাথে বসানো হয়। এটা কি ঠিক? যদি ঠিক না হয়, তাহলে আমরা কীভাবে আয়োজনটা করতে পারি?

-আবূ সোয়াইব
গাইবান্ধা।

উত্তর: কোনো খাবার অনুষ্ঠানে মহিলাদের যাওয়া ঠিক নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ ও মহিলা ছাহাবীগণ কোনো খাবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে, এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব, নারীদের এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া বন্ধ করতে হবে। এসব হিন্দুয়ানী কুসংস্কার। নিতান্তই যদি যেতেই হয়, তাহলে পুরুষ ও নারীর আলাদা ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। তা না হলে পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর মুমিন নারীদেরকে বলো, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায়, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না' (আন-নূর, ২৪/৩১)। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা তার স্ত্রীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র' (আল-আহযাব, ৩৩/৫৩)। এজন্য পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে নারী পুরুষের আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন (২৮): নযরের জিনিস মসজিদে দেওয়া যাবে কি? মসজিদে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে কি?

-মাহবুবুর রহমান মাদানী
রাজশাহী।

উত্তর: যদি কেউ মসজিদের জন্য কোনো নযর করে থাকে, যেমন: আমার যদি অমুক কাজটি হয়, তাহলে আমি মসজিদে ১০ বস্তা সিমেন্ট দিব। এক্ষেত্রে তা মসজিদে প্রদান করা জায়েয। আর যদি তা মসজিদের কাজে না লাগে, তাহলে তা বিক্রি করে মসজিদের উন্নয়ন বা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করা বৈধ। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মানত করে, সে যেন পূর্ণ করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানীর মানত করে, সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৬)। তবে মসজিদের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। ক্রয়-বিক্রয় মসজিদের বাহিরে হতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন তোমরা মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে, তখন বলবে, আল্লাহ যেন আপনার ব্যবসায় লাভ না দেন' (তিরমিযী হা/১৩২১)।

প্রশ্ন (২৯): হারাম শরীফ বা মদীনার নামে কসম করা যাবে কি?

-আহনাফ
দিনাজপুর।

উত্তর: হারাম শরীফ বা মদীনার নামে কসম করা যাবে না। সাঈদ ইবনু আবূ উবায়দা রহিমাহুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এক ব্যক্তিকে এভাবে শপথ করতে শুনলেন, না! এ কা'বার শপথ! তখন ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে সে শিরক করল' (আবূ দাঊদ, হা/৩২৫১)। শুধুমাত্র আল্লাহর নামেই কসম হতে হবে। এজন্য হারামের বা কা'বার মালিকের নামে (আল্লাহ) কসম করা যাবে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন কসম করার ইচ্ছা করবে, তখন বলবে, কা'বার রবের কসম!' (সুনানে নাসাঈ, হা/৩৭৭৩)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না। যে ব্যক্তি কসম করবে সে যেন আল্লাহর নামেই কসম করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৪০১)।

প্রশ্ন (৩০): একজন নারী কি কেবিন ক্রু বা বিমানবালা হিসেবে চাকরি করতে পারবে?

-আফরিন
ঢাকা।

উত্তর: একজন নারী বিমানবালা হিসেবে চাকরি করতে পারবে না। কারণ- ১. পুরুষ যাত্রী ও সহকর্মীদের সাথে মেলামেশা করতে হয়, যা ইসলামে হারাম (আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)। ২. তাদের নির্দিষ্ট ড্রেস কোড আছে, যা সাধারণত টাইটফিট বা অর্ধ-উন্মুক্ত হয়ে থাকে, যাতে শালীনতা বজায় থাকে না। ৩. ফিতনার আশঙ্কা বা নিরাপত্তাহীনতা থাকে। ৪. মাহরাম ছাড়াই একাকী সফর করতে হয়। ৫. অনেক সময় মদ বা হারাম খাবার পরিবেশন করতে হতে পারে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নারী হলো আবরণীয় বস্তু। যখন সে বাহিরে বের হয়, শয়তান তাকে সুশোভিত করে তোলে' (তিরমিযী, হা/১১৭৩)।

প্রশ্ন (৩১): কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে তার পক্ষ থেকে ফকির-মিসকীনের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা যাবে কি?

-আবূ সোয়াইব
গাইবান্ধা।

উত্তর: অসুস্থ ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে তার সুস্থতার জন্য ফকির-মিসকীনদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা যাবে না। তবে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দান-ছাদাকা করা যায়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ 'তোমরা ছাদাকার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো' (ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৭৪৪; বায়হাকী, হা/৬৫৯৩)। হাদীছে এসেছে, 'ছাদাকা আল্লাহর ক্রোধ নিবারণ করে দেয়' (তিরমিযী, হা/৬৬৪)।

প্রশ্ন (৩২): আমি কর্মসূত্রে আশুলিয়ায় বসবাস করি। এখানে অনেক বাসাতে দেখা যায়, লাইনের গ্যাস ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বাস্তবে সেগুলো অবৈধ। অনেক বাসা এমনও আছে, যার কিছু চুলা বৈধ ও বাকিগুলো অবৈধ। এমতাবস্থায় এসব বাড়িতে বাসা ভাড়া নেওয়া এবং চুলা ব্যবহার করা বৈধ হবে কি?

-আল-আমিন
আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর: গ্যাস একটি সরকারি মালিকানাধীন সম্পদ, যা জনগণের জন্য নির্ধারিত। নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে তা ব্যবহার করা চুরি হিসেবে গণ্য হবে, যা ইসলামে হারাম। মালিকের এমন অবৈধ চুলার লাইন নেওয়া ঠিক হয়নি। তাকে বৈধ লাইন নিতে হবে। একজন ভাড়াটিয়া হিসেবে বাড়িওয়ালার সাথে আলোচনা করে বৈধ চুলা ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় জেনেশুনে অবৈধ চুলা ব্যবহার করলে তিনিও দায়ী থাকবেন। আল্লাহ তাআলা

বলেন, ‘সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩৩): অধিক বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে পর্দাহীন মহিলার উপস্থাপনায় বা কোনো মহিলার উপস্থাপনায় জামাকাপড় ও অন্যান্য আসবাবপত্রের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পুরুষ কি মহিলাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারে?

-মুস্তাকিম
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর: বিজ্ঞাপনে নারীর ছবি ব্যবহার করা বা নারীদের দিয়ে বিজ্ঞাপন ভিডিও দেওয়া যাবে না। ইসলামে নারীর সৌন্দর্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করা হারাম। আর ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ভিডিও দেখা চোখের যেনা। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ‘চোখের যেনা হলো তাকানো’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৪৩)।

প্রশ্ন (৩৪): সন্দেহপূর্ণ কাজ করা যাবে কি?

-ছানোয়ারা
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর: যাবে না। কেননা সন্দেহপূর্ণ কাজ হারামের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, ‘এই সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত। সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’ (আল-বাকারা, ২/১৪৭)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে রক্ষা করে। আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয়, সে হারামেই পতিত হবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫২)।

প্রশ্ন (৩৫): কোনো মেয়ে যদি ছেলেদের পোশাক ঘরে পরিধান করে, এটা কি জায়েয হবে?

-পিয়াস মাহমুদ
জামালপুর, ইসলামপুর।

উত্তর: ঘরে-বাহিরে, গোপনে-প্রকাশ্যে কোনো অবস্থায় মহিলারা পুরুষের পোশাক আর পুরুষ মহিলার পোশাক পরিধান করতে পারবে না। যারা তা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐসব পুরুষদেরকে লা‘নত করেছেন, যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐসব নারীদেরকেও লা‘নত করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫)। সুতরাং এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৬): জীবনবীমায় চাকরি করা জায়েয হবে কি?

-ইমতিয়াজ
ঢাকা, মুগদা।

উত্তর: কোনো ইন্স্যুরেন্স বা বীমা কোম্পানিতে চাকরি করা যাবে না। কেননা এ কোম্পানিগুলো সূদী কার্যক্রমের উপর পরিচালিত হয়। আর আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে বৈধ করেছেন আর সূদকে হারাম করেছেন (আল-বাকারা, ২/২৭৫)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূদদাতা, গ্রহীতা, লেখক ও দুই সাক্ষী সকলকেই লা‘নত করেছেন আর বলেছেন যে, (পাপের দিক দিয়ে) এরা সকলেই সমান (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)।

প্রশ্ন (৩৭): চেয়ারে অথবা সোফায় বসে পায়ের উপর পা তুলে বসা যাবে কি?

-ইলিয়াস শেখ
ইব্রাহিমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

উত্তর: পায়ের উপর পা তুলে বসাতে শারঈ কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আব্বাদ ইবনু তামীম রাহিমাহুল্লাহ তার চাচা হতে বর্ণনা করেন, তার চাচা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে মসজিদে চিত হয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। ইবনু শিহাব রাহিমাহুল্লাহ সাঈদ ইবনু মুছায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, উমার ও উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা এমন করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪৭৫)। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, বড়দের সম্মানার্থে তাদের সামনে এভাবে বসা উচিত নয় আর কারো সামনে এভাবে বসাতে অহংকার বা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি যেন না থাকে।

প্রশ্ন (৩৮): আমি একটি হিমাগারে চাকরি করি। আমি যদি আমার বন্ধুর আলু বিক্রয় করে দেই আর ক্রেতা যদি ক্রয় মূল্য পরিশোধ করার পর আমাকে অতিরিক্ত টাকা দেয়, তাহলে তা নেওয়া আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-ইয়াসমিন
দিনাজপুর।

উত্তর: না, এই অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ এটি ঘুষ বা স্বার্থনির্ভর উপহার হিসেবে গণ্য হবে। কেননা মূল্য পরিশোধের পর কোনো সুবিধার বিনিময়েই তিনি এই অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কর্মচারীদের উপহার গ্রহণ করা খেয়ানত’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩২)। আবূ উমামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূত্রে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের জন্য কোনো বিষয়ে সুপারিশ করার কারণে যদি সে তাকে কিছু উপহার দেয়

এবং সে তা গ্রহণ করে, তাহলে সে সূদের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করল’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৪১)। বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমরা কাউকে সরকারি পদে নিযুক্ত করলে তার আহারের ব্যবস্থাও আমার দায়িত্ব। পরে সে অতিরিক্ত কিছু নিলে, তবে তা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য হবে’ (আবূ দাঊদ, হা/২৯৪৩)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৯): মুরগির গলার ভিতরে যে সাদা রগ থাকে সেটি এবং শিং মাছে যে রগ থাকে এই দুইটা খাওয়া কি হালাল নাকি হারাম?

-বুশরা
ঢাকা।

উত্তর: হালালভাবে যবেহকৃত মুরগির গলার ভিতরের সাদা রগ এবং শিং মাছের সাদা রগ খাওয়া বৈধ। কেননা শরীআতে এগুলো হারাম হওয়ার কোনো দলীল নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘বলুন, আমার প্রতি যা অহী করা হয়েছে, তাতে আহারকারী যা আহার করে তার মাঝে আমি কোনো বস্তু হারাম পাই না- মৃত জীব, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস ছাড়া’ (আল-আনআম, ৬/১৪৫)। তবে কেউ যদি কোনো হালাল কিছু না খায়, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

প্রশ্ন (৪০): সান্ডা ও গুইসাপ খাওয়া কি হালাল?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: সান্ডা বা দব হালাল প্রাণী। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দব্ব (সান্ডা) আমি খাই না আর হারামও বলি না’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৩৬)। অন্য বর্ণনায় আছে, ‘কিন্তু যেহেতু এটি আমাদের এলাকায় নেই। তাই এটি খাওয়া আমি পছন্দ করি না’। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সেটি টেনে নিয়ে খেতে থাকলাম। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৯১)। তবে গুইসাপ ও সান্ডা এক প্রাণী নয়। গুইসাপের তুলনায় সান্ডার দেহ সাধারণত ছোট হয় এবং এর লেজ মোটা ও খাঁজকাটা থাকে। সান্ডা নিরীহ এবং নিরামিষভোজী। অপরদিকে গুইসাপ হিংস্র এবং মাংসাশী। গুইসাপ একটি উভচর প্রাণী, যাকে সাধারণত পুকুর, নদী বা জলাশয় এবং মাটিতেও দেখা যায়। এরা মাংসাশী এবং অনেক সময় মৃত প্রাণী খেয়ে থাকে। এজন্য গুইসাপ হালাল প্রাণী নয়।

আকীকা

প্রশ্ন (৪১): আকীকার গোশত কয় ভাগে ভাগ করতে হয়? আকীকার গোশত বাবা-মা খেতে পারবে কি?

-পিয়াস মাহমুদ
জামালপুর, ইসলামপুর।

উত্তর: আকীকার গোশত আকীকাদাতার নিজস্ব সম্পদ। সুতরাং আকীকাদাতা যা ভালো মনে করবেন তাই করতে পারেন। আকীকার গোশত শুধু বাবা-মা নয়, যে কেউ খেতে পারে। আকীকার গোশত পিতামাতা খেতে পারবে না, এটা একটা কুসংস্কার। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘প্রত্যেক শিশু তার আকীকার বিনিময়ে দায়বদ্ধ থাকে। কাজেই সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকীকা যবেহ করবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করে নাম রাখবে’ (সুনানে আবূ দাঊদ, ২/৩৯২)।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৪২): আমি একজন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেই এবং সে সম্মত হয়। আমরা একে অপরকে পছন্দ করি। আমরা নিজেদেরকে জানার জন্য কথা বলছি এবং অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা হয় না। যতটুকু দরকার ততটুকু কথা বলেই শেষ করি। এখন এটা কী যেনার আওতায় পড়ে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: প্রথমত, বিবাহের প্রস্তাব মেয়েকে নয়, বরং মেয়ের অভিভাবককে দিতে হবে। কেননা অভিভাবক মেয়ের যাবতীয় বিষয়ে দায়িত্বশীল। অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হবে না (তিরমিযী হা/১১০২)। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কাজেই তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে তাদের মনিবের অনুমতিক্রমে’ (আন-নিসা, ৪/২৫)। দ্বিতীয়ত, স্বামী-স্ত্রী ইজাব-কবুল হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা একজন অপরজনের অপরিচিত মানুষ। তাদের পর্দা করা ফরয। তাই কোনো কিছু জানার প্রয়োজন হলে অভিভাবকের উপস্থিতিতে বা কারো মাধ্যম দিয়ে জানতে পারে। সরাসরি অবাধে কথাবার্তা বলা বা কোথাও দেখা করা যাবে না। এটা যেনার অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা বেগানা নারী পুরুষের মধ্যে যদি কথাবার্তা হয়, তাহলে তাদের মাঝখানে শয়তান প্রবেশ করে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কোনো পুরুষ যেন কোনো মহিলার সঙ্গে নির্জনে একত্রিত না হয়। কেননা শয়তান অবশ্যই তাদের তৃতীয়জন হিসেবে হাযির থাকে’ (তিরমিযী, হা/১১৭১)।

প্রশ্ন (৪৩): তালাকপ্রাপ্তা নারী কতদিন ইদ্দত পালন করবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: স্বামী যদি সহবাসের পূর্বেই তালাক দেয়, তাহলে ইদ্দতের কোনো প্রয়োজন নেই (আল-আহযাব, ৩৩/৪৯)। আর সহবাসের পর তালাক দেওয়া হলে ইদ্দত হলো তিন হায়েয। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন মাসিকস্রাব কাল অপেক্ষায় থাকবে' (আল-বাকারা, ২/২২৮)। মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে বা অপ্রাপ্তবয়স্ক তথা মাসিক না হলে তাদের তালাকের পর তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে। আর গর্ভবতীদের ইদ্দত সন্তান হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের যেসব স্ত্রী আর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত' (আত-তালাক, ৬৫/৪)।

উত্তরাধিকার

প্রশ্ন (৪৪): মৃত পিতার সম্পত্তিতে এক ছেলে, এক মেয়ে ও এক স্ত্রী এর মধ্যে কীভাবে বণ্টন হবে? উদাহরণস্বরূপ- ৩০০০০০ টাকা থাকলে এক ছেলে, এক মেয়ে ও এক স্ত্রী কে কত পাবে?

-মো. কানব হাসনাত
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উত্তর: যেহেতু মৃত ব্যক্তির সন্তান আছে, সুতরাং তার স্ত্রী পাবে এক-অষ্টমাংশ। আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান-সন্ততি থাকে, তাহলে তোমরা যা অছিয়ত করবে সেই অছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তাদের (স্ত্রীদের) জন্য এক-অষ্টমাংশ (আন-নিসা, ৪/১২)। সুতরাং স্ত্রী পাবে ৩৭,৫০০ টাকা। আর বাকি অংশ থেকে ছেলে পাবে মেয়ের দ্বিগুণ (আন-নিসা, ৪/১১)। সুতরাং ছেলে পাবে ১৭৫,০০০ আর মেয়ে পাবে ৮৭,৫০০।

প্রশ্ন (৪৫): আমার ভাই আগে মারা গিয়েছে, বাবা পরে মারা গিয়েছে। এমতাবস্থায় বাবার পরিত্যক্ত সম্পদে ওই মৃত ভাইয়ের সন্তানেরা কতটুকু অংশ পাবে?

-নাজনীন পারভিন
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: ভাইয়ের সন্তানেরা কোনো অংশ পাবে না। কেননা সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সন্তানের উপস্থিতিতে সন্তানের সন্তানেরা বঞ্চিত হয়। তাই পিতা-মাতার মৃত্যুর পূর্বে সন্তান মারা গেলে সন্তানের সন্তানেরা অর্থাৎ নাতি-নাতনীরা দাদা-দাদীর সম্পদের ওয়ারিছ হবে না। তবে দাদা-দাদী এমন নাতি-নাতনীর জন্য অছিয়ত করে যেতে পারে। কিন্তু সেই অছিয়ত হবে সর্বোচ্চ তিন ভাগের একভাগ (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৪২)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে মুসলিম ব্যক্তির অছিয়ত করার মতো কিছু সম্পদ রয়েছে, সে ব্যক্তির জন্য তার নিজের কাছে অছিয়তনামা লিখে না রেখে দুই রাত্রিও অতিবাহিত করার অধিকার তার নেই' (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৭)।

প্রশ্ন (৪৬): আমার মা তার সব সম্পত্তি মামাদের দিয়ে গেলে আমরা তো বঞ্চিত হবো। এতে কি আমার মা গুনাহগার হবে?

-মো. নাছিম মিয়া
ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

উত্তর: কোনো ব্যক্তি তার সব সম্পদ কাউকে দান করে দিতে পারবে না। যদি তিনি ওয়ারিছদের বঞ্চিত করে এমনটি করেন, তাহলে তিনি পাপী হবে। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কি আমার সমুদয় মালের ব্যাপারে অছিয়ত করে যাব? তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, তবে অর্ধেক? তিনি ইরশাদ করলেন, 'না'। আমি বললাম, তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি ইরশাদ করলেন, 'এক-তৃতীয়াংশ আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক। ওয়ারিছগণকে দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাবার চেয়ে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম' (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৪২)। সুতরাং কোনো ব্যক্তি তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ যারা তার ওয়ারিছ নয় তাদের জন্য অছিয়ত বা উইল করে যেতে পারেন।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৭): জনৈক বক্তা বলেছেন, হাদীছে আছে, সকালে খালি পেটে পানি পান করতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন! এমন কোনো হাদীছ আছে কি?

-আবূ বকর
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'খালি পেটে সকালে পানি পান করা নিষেধ'— এমন কোনো হাদীছ বর্ণিত হয়নি। এটা একটা কুসংস্কার। স্বাভাবিকভাবে যেকোনো সময় পানি পান করা যাবে। বরং সকালে খালি পেটে পানি পান করলে শরীর সুস্থ থাকে।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৮): বাসা-বাড়িতে জিন সাপ চেনার উপায় কী? দেখার পর করণীয় কী?

-শাহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তর: বাড়িতে সাপ দেখলেই মেরে ফেলা যাবে না। তাকে তিন দিন সময় দিতে হবে। তিনদিন পরেও যদি থাকে, তাহলে সে শয়তান। তাকে হত্যা করতে হবে। মদীনায় সাপের ছোবলে এক ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর রাসূল ﷺ-কে জানানো হলে তিনি বলেন, ‘মদীনায় কিছু জিন রয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই (সাপ রূপে) তাদের তোমরা লক্ষ্য করলে, তোমরা তাকে তিনদিন সাবধান সংকেত দিবে। তারপরে তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেলে তাকে হত্যা করবে। কারণ সে একটি শয়তান’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭৩২)। রাসূল ﷺ উপরিউক্ত পদ্ধতিকেই জিন সাপ আর সাধারণ সাপকে চেনার উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন (৪৯): বাবা মারা গেছে। বাবার পরকালের কল্যাণের জন্য কী কী দু‘আ ও কাজ করতে পারি, যা দ্বারা বাবার উপকার হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফিরোজ কবীর
নওগাঁ সদর।

উত্তর: মৃত বাবা-মার জন্য সন্তানের করণীয়- ১. তাদের জন্য দু‘আ করা। বিশেষ করে এ দু‘আ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (বনী ইসরাঈল, ১৭/২৪)। ২. বাবা-মার জন্য দান-ছাদাকা করা (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩০)। ৩. তাদের কোনো মানতের বা কাযা ছিয়াম থাকলে তা পালন করা (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫২)। ৪. তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা করা (নাসাঈ, হা/২৬৩৭)। ৫. মাঝে মাঝে তাদের করব যিয়ারত করা ও সেখানে দু‘আ করা (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৭)। ৬. তাদের ঋণ পরিশোধ করা ও অছিয়ত করে গেলে তা পূরণ করা (ইবনু মাজাহ, হা/২৪১৩)। ৭. তাদের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫২)।

প্রশ্ন (৫০): আমি একজন শিক্ষক। গাইড কোম্পানি আমাদের মাঝেমধ্যে কিছু টাকা দেয়। ওই টাকা নেওয়া কি জায়েয হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পাঁচদোনা, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।

উত্তর: না, এই অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ এটি ঘুষ বা স্বার্থনির্ভর উপহার হিসেবে গণ্য হবে, যা শরীআত ও নৈতিক দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। যদি গাইড কোম্পানি এই টাকা দেয় এই শর্তে বা প্রত্যাশায় যে, শিক্ষকরা তাদের বই স্কুলে চালাবে; তাহলে এটা স্পষ্টতই ঘুষ, যা কুরআন ও হাদীছে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নবী ﷺ বলেন, لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ‘আল্লাহ তাআলা ঘুষদাতা ও গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০)। এটি ‘উপহার’ হলেও, তা দায়িত্বের কারণে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ‘কর্মচারীদের উপহার গ্রহণ করা খেয়ানত’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩২)। তাই একজন জনসেবার দায়িত্বশীল ব্যক্তি শিক্ষকের দায়িত্বের সুবাদে আসা উপহার গ্রহণ করা জায়েয নয়। এটা ধোঁকা ও ছাত্র-অভিভাবকদের সাথে প্রতারণা। এটা আমানতের খেয়ানত। সুতরাং এই টাকা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

আনাস হোমিও এন্ড হিজামা কেয়ার
মো: মনিরুল ইসলাম হোমিও চিকিৎসক ও হিজামা থেরাপিস্ট, ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)
চিকিৎসা সেবাসমূহ
■ বিনা অপারেশনে নাকের পলিপাস
■ বিনা অপারেশনে পাইলস, টনসিল ও টিউমার
■ বিনা অপারেশনে গ্যাস্ট্রিক ও পেপটিক আলসার
■ বিনা অপারেশনে কিডনীর পাথর ও মুত্রথলীর পাথর
■ বিনা অপারেশনে অ্যাপেন্ডিসাইটিস
■ প্রসাবের ইনফেকশন
■ হাঁটু, কোমরের, জয়েন্টের, হাঁড় ক্ষয় ও বৃদ্ধি এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতিজনিত ব্যথা
■ এছাড়াও এলার্জি, চর্ম ও যৌন, শ্বাসকষ্ট, এবং মহিলাদের অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা হয়
(বি.দ্র. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রুগীর সাথে কথা বলে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারের মাধ্যমে ঔষধ পাঠানো হয়)
হুজরীপাড়া (বানকের মোড়), দারুশা, কর্ণহার, রাজশাহী। ০১৭৩৮-১৮২১৪৪ anashomeocare

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

www.al-itisam.com

Monthly Al-Itisam الإعتصام 9th Year, 10th Part, August 2025, Price : 30.00